সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণাগুলো কী

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

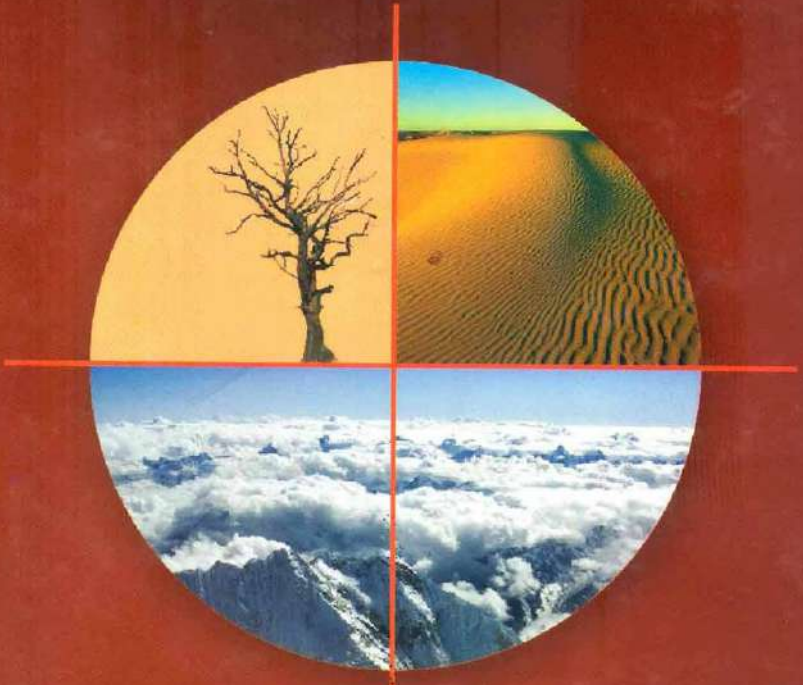

লেখক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং বিজ্ঞান লেখক হিসাবে সুপরিচিত। এদেশের প্রথম জনতোষ বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তাঁর সম্পাদনায় এখন নিয়মিত প্রকাশনার পঞ্চম দশকে রয়েছে। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা অসংখ্য। বইয়ের সংখ্যাও পঞ্চাশের কাছাকাছি। ২০০৭ সালের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৮ সালে মেহের কবীর বিজ্ঞান সাহিত্য পুরস্কার তাঁর এই বিষয়ক স্বীকৃতিগুলোর সাম্প্রতিকতম। নিজের বিষয় পদার্থবিদ্যার বাইরেও বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ রয়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে সেটি যেমন প্রকাশিত তেমনি টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর দীর্ঘ দিনের অবদানেও তা পরিস্ফুটিত। তিনি 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' শীর্ষক একটি বক্তৃতামালায় নিয়মিত সর্বসাধারণের সামনে আকর্ষণীয় বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই বইটি সেই বক্তৃতামালারই একটি বিষয়ের পুস্তকরূপ। চ্যানেল আই এই বক্তৃতামালাটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে টেলিভিশনে সম্প্রচার করে থাকে।

সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণাগুলো কী?

৭ম বই

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বক্তৃতামালার ভূমিকা

'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' এই শিরোনামে বক্তৃতামালাটি আয়োজিত হয়েছে সিএমইএস ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে। বিজ্ঞানের একেবারে আধুনিক জ্ঞানগুলো সর্বসাধারণের বুঝার ও উপভোগ করার উপযোগী করে তুলে ধরার জন্যই এই আয়োজন। সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ পরিস্থিতিটি জানাবার দায়িত্বও এই বক্তৃতামালা নিয়েছে। ফলে সাম্প্রতিকতম অবস্থাটির খোঁজে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান জার্নাল ও ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যের অনুসন্ধান করতে হয়েছে। সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যেন বাদ না পড়ে সেই চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি বিষয়টির অ-আ-ক-খ অনেকের অজানা থাকতে পারে বলে সেই পরিচিতি স্তর থেকেই শুরু করতে হয়েছে। এটি করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞের ভঙ্গি, ভাষা, টেকনিক্যাল শব্দাবলি, সংকেত, গণিতের ব্যবহার ইত্যাদিকে এড়িয়ে চলতে হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয় আলোচনা করতে হলে এগুলোর প্রত্যেকটি প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একমাত্র এগুলোর মাধ্যমই বৈজ্ঞানিক জটিলতাকে সহজে নির্ভুলভাবে অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব। অথচ তা করতে গেলে শ্রোতারা এগুলোর সঙ্গে অন্তত কিছুটা হলেও পরিচিত থাকবেন এমন প্রত্যাশা করতে হয়। তখন ব্যাপারটি আর 'সবার জন্য' থাকে না। তাই বক্তৃতাকে সব সময় ছিমছাম রাখা সম্ভব হয়নি একে সর্বজনবোধ্য করার স্বার্থে। বরং আমরা চেষ্টা করেছি সাধারণ সরল ধারণার ভিত্তিতেই অতি আধুনিক এই ব্যতিক্রমী ধারণাগুলোকে খাড়া করতে। স্কুলের সাধারণ বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু জেনেছি শুধু ঐটুকুই সম্বল করে এগোবার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে বুঝিয়ে বলতে হয়েছে বেশি, উপমা ব্যবহার করতেও হয়েছে বেশি।

বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি মূল সুর অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ মূল সুর হলো মানুষকে নিয়ে। আমরা ধরে নিয়েছি সবাই একটি বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হবেন– তা হলো নিজেদেরকে নিয়ে। মানুষ হিসেবে আমাদের অবস্থান কোথায়? আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, আমরা কী দিয়ে গড়া, কেমন করে আমরা ভাবি, কেমন করে কাজ করি, অন্য সব কিছুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী, ভবিষ্যতে আমাদের কী হতে পারে– এসব প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই সবার কৌতূহল অনেক বেশি। তাই সর্বশেষ বিজ্ঞানকে আমাদের নিজেদের সঙ্গে যত বেশি যুক্ত করা যাবে ততই আগ্রহ বাড়বে, সেটি যদি জটিল আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ও হয় তাও। তাই আমরা মোটের ওপর মানবকেন্দ্রিক বিশ্ব ইতিহাসকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি বক্তৃতা মালায়। একেবারে সময়পঞ্জি অনুযায়ী ইতিহাস নয়, তবে মানুষের শিকড় কোথায় কীভাবে কতদূরে বিস্তৃত হয়েছে সেই প্রশ্নকেই নানাভাবে বক্তৃতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন কোন বিষয়কে ধারণ করা হয়েছে প্রায় দুই ঘণ্টার একটিমাত্র বক্তৃতায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের জন্য এ রকম দুটি, তিনটি এমনকি চারটি বক্তৃতারও প্রয়োজন হয়েছে– কিছু দিন পরপর। অবশ্য প্রত্যেকদিনের বক্তৃতার সঙ্গেই প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা ছিল, যাতে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের নতুন কৌতূহলগুলোকে মিটানোর কিছুটা চেষ্টা করা যায়। এ বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এই সিরিজের বইগুলো। বক্তৃতার টেলিভিশন সিরিজ, এর সিডি রেকর্ডিং এবং বইয়ের এই সিরিজ সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞানের একটি ধারণা দিতে পারবে বলেই আশা করছি।

ফেব্রুয়ারি ২০০৯ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

এই বইয়ের ভূমিকা

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দুশ্চিন্তা নূতন কিছু নয়। কিন্তু এটি সর্বসাধারণের মুখে মুখে এসেছে সাম্প্রতিককালে। এখন আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটলেই আমাদের প্রবণতা হলো বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনকে তার জন্য দায়ী করা। এর অনেক কিছু যে সত্যিই গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রারম্ভিক আলামত তাতে এখন কোন সন্দেহ নাই, যদিও আবহাওয়ার সব ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য একে দায়ী করা যায় না। অথচ অল্প কিছু দিন আগেও বিশ্বজুড়ে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে নানা মত ছিল, এমনকি কোন কোন বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। সেই অবস্থা দূর হয়ে এখন বিষয়টি দুনিয়ার সকলের কাছে, বিশ্বনেতাদের কাছেও সব চেয়ে জরুরী বিষয়গুলোর অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তনটি ঘটেছে এ সম্পর্কে গবেষণার দ্রুত অগ্রগতির কারণে। গবেষণার সাম্প্রতিক ফলাফল জলবায়ু পরিবর্তনকে এখন এমন স্পষ্ট করে তুলেছে যে কারো পক্ষেই এর প্রতি নির্লিপ্ত থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। আর এ কারণেই বিষয়টিকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে হলে এর পেছনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোর ভিত্তিটি সবার বুঝার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন আগামীতে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ভয়াবহ অপরিবর্তনীয় দুর্যোগ বহন করে আনার হুমকি দিচ্ছে। আর এর প্রতিকারের একমাত্র সম্ভাবনা হচ্ছে সকল দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার ভঙ্গিতে এখনই বড় ধরনের পরিবর্তন আনার মধ্যে। এ জন্য প্রত্যেক মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং হবে শুধু এই সচেতনতাই যথেষ্ট নয়; বরং এটি আসলে কী, কীভাবে আমরা একে জানছি, বুঝছি, আজ কী করলে ভবিষ্যতে কী হতে পারে– এই সব বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। গবেষণাগুলো সম্পর্কে সবার জানার প্রয়োজনটি এখানেই। এই বইটিতে সেই চেষ্টাটুকুই করা হয়েছে– সবার জন্য বোধগম্য করে গবেষণাগুলোকে

উপস্থাপিত করার চেষ্টায়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি সরল রেখায় চলছেনা, চক্রবৃদ্ধি হারে ক্রমেই তীব্রতর হওয়ার ফলে এর মধ্যে সৃষ্টি হয় যথেষ্ট অনিশ্চয়তা। এসবের একটি পরিণতি হলো সামনে অভাবনীয় দ্রুত গতিতে প্রতিকূল অবস্থাগুলো সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। এটিই সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, আর এটিই আমাদের সবার সামনে সক্রিয় হবার বড় চ্যালেঞ্জ। এই বইয়ে এই দিকটিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

গ্রীন হাউসের মত, তবে প্রক্রিয়া ভিন্ন - - - ৯
বরফের পরতে পরতে ইতিহাস - - - - - -১৭
জগদ্দল বরফ ভাঙ্গছে, গলছে- - - - - - - ৩১
চক্রবৃদ্ধির পাগলা ঘোড়া- - - - - - - - - -৪২
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী হচ্ছে - - - -৫০
নানা দৃশ্যকল্পে নানা ভবিষ্যৎ - - - - - - -৬১
আমাদের একটিই পৃথিবী - - - - - - - - -৬৮
প্রশ্নোত্তর - - - - - - - - - - - - - - - ৭৪

গ্রীন হাউসের মত, তবে প্রক্রিয়া ভিন্ন

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কথা নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে, এর প্রতিকারে দেশে দেশে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বেশ কয়েক দশক ধরে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এর কথা জানা গেছে শতবর্ষ ধরে। তবুও কয়েক বছর মাত্র হলো যে বিষয়টি সবার মুখে মুখে এসেছে। এতদিন অনেক বোদ্ধা মানুষকেও এর গুরুতর পরিণতিকে অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখতে দেখা গেছে। কখনো কখনো গোষ্ঠি বিশেষের অর্থনৈতিক স্বার্থও সে রকম অবিশ্বাসকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। তবে কিছুটা হঠাৎ করেই যেন অবিশ্বাসগুলো হালে আর পানি পাচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বশেষ ফলাফলগুলোর অনিবার্যতা এবং স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণে তার ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীই এই ব্যাপক সচেতনতা ঘটাতে পেরেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যেই বেশ কিছু প্রকট আকারে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এসব কিছু কিছু ফলতেও আরম্ভ করেছে যেমন আমাদের দেশে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের অধিকতর প্রকোপ, এবং ইউরোপের অস্বাভাবিক রকম চরম গ্রীষ্ম ও শৈত্য। তবে যা এখনো সর্বসাধারণের কাছে খুব স্পষ্ট হয়নি তা হলো কী ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভবিষ্যতের জন্য এরকম দু:সংবাদ দিচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে আধুনিক গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ ও কম্পিউটার মডেলিং এ সব বিষয়কে অনেক বেশি স্পষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী বলে প্রমাণিত করেছে। এখানে আমরা সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করবো সবার বোধগম্য ভাষাতে।

আমরা উদ্বিগ্ন আমাদের কালের এবং অদূর ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে। কিন্তু অনুরূপ কারণে জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর সাড়ে চারশত কোটি বছরের ইতিহাসে বার বার ঘটেছে, কখনো অত্যন্ত বড় আকারে। এদের বেশ কয়েকটি পৃথিবীকে প্রাণের উপযুক্ত করে তুলতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন পৃথিবীর শৈশবে এর বায়ুমন্ডলে প্রাকৃতিক ভাবে উচ্চমাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ছিল বলে ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে এখানে পানি তরল হিসাবে

থাকতে পেরেছে, মঙ্গল গ্রহের মত সব বরফে পরিণত হয়নি। যদি হতো তা হলে এটিও প্রাণহীন গ্রহে পরিণত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আবার প্রাকৃতিকভাবে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মেঘ এসিড বৃষ্টি হয়ে নেমে এসে কার্বনেট শিলায় এর কার্বন বাঁধা পড়েছে বলে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়তে পারেনি ভূ-পৃষ্ঠ, নইলে এটি শুক্র গ্রহের মতই প্রাণহীন উত্তপ্ত গোলকে পরিণত হতো। কাজেই যে প্রক্রিয়াটির কথা নিয়ে আমরা এত উদ্বিগ্ন পৃথিবীতে সেটি নূতন কিছু নয়। সমস্যা হলো এখন যা হচ্ছে তা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট ঘটনা এবং আমাদের ভবিষ্যতকে এটি বিপর্যস্ত করছে।

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জীবন যাপন পদ্ধতিকে গত বেশ কিছুদিন ধরে এমন দিকে ধাবিত করেছি যে তাতে বায়ুমন্ডলের প্রাকৃতিক ভারসাম্যে আমরা গুরুতর বাধ সেধেছি। এর ফলে দেখা দিয়েছে লাগামছাড়া প্রতিক্রিয়া যা ক্রমবর্দ্ধমান হারে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি সৃষ্টি করেছে। বিপত্তিটি এখানেই। বর্তমান এই বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের বড় বৈশিষ্ট এটি মানব-সৃষ্ট।

সচেতনতার উন্মেষ

মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে সর্ব প্রথম সবিস্তারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরেনিয়াস ১৮৯৬ সালে। সে সময়ে ক্রমবর্দ্ধমান শিল্প কারখানা থেকে উদ্গীর্ণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ফলে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ক্রমাগত একটু একটু করে বাড়ছে, আর এর প্রভাব জলবায়ুর উপর পড়বে এমন সতর্কবাণী তিনি দিয়েছিলেন। এরও আগে আরো দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী টিন্ডাল ১৮৬০ সালে এবং ফুরিয়ার ১৮২৭ সালে এ ধরনের ঘটনার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে। তবে একেবারে হিসাব নিকাশ করে স্পষ্টভাবে বিশ্ব উত্তাপ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রথম উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৪০ সালে, এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক উপাত্তের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলের বাইরে প্রথম উদ্বেগের সূচনা হয় ১৯৮০ এর দশকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনেরিওতে বিশ্বনেতারা সমবেত হন ধরিত্রী সম্মেলনে। সেখানে এর

প্রতিকারে দেয়া হয় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি 'এজেন্ডা একুশ' (একুবিংশ শতাব্দীকে লক্ষ্য করে)। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োতোতে বিশ্ব-সম্মেলনে রচিত হয় কিয়োতো প্রটোকল– যাতে জলবায়ু পরিবর্তনে বাধা দেয়ার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের ক্ষেত্রে কোন দেশ কী করতে পারবে, কী করতে পারবেনা তার বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছিল সমঝোতার মাধ্যমে। কিন্তু এ সমঝোতায় যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশ শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষর না করায় উদ্যোগ পুরাপুরি এগুতে পারেনি। পরে সমস্যাগুলো নিয়ে আরো বেশ কয়েকবার বিশ্ব-সমঝোতার অগ্রগতি হয়েছে।

এ সম্পর্কে উপলব্ধিতে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তসরকারী প্যানেলের (আইপিসিসি) সংগৃহীত সর্বশেষ উপাত্ত ও গবেষণা ফলাফল নিয়ে ২০০৭ সালের রিপোর্টের মাধ্যমে। এটি অনেকের টনক নড়িয়েছে, এবং এর কাজের জন্য ২০০৭ সালের শান্তিতে লেবেল পুরস্কারের অর্ধেকটি পেয়েছে আইপিসিসি, এবং বাকি অর্ধেকটি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁর অবদানের জন্য।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয় হলো এটি সরল রেখায় চলছেনা। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু চক্রবৃদ্ধির বিষয়। শুরুতে অল্প বৃদ্ধি অন্য আরো বড় বৃদ্ধির সুযোগ করে দিচ্ছে যা ঠিক কী হারে তার হিসাব করা দুরূহ। কাজেই পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত ভাবেই দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যে কোন সময় আরো বদলে যেতে পারে। এ জন্য সাম্প্রতিকতম উপাত্ত না পেলে অবস্থার পুরো গুরুত্ব তুলে ধরা কঠিন হচ্ছে। এখন তাই এই চক্রবৃদ্ধির প্রকৃতিগুলো আরো ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের আলোচনায় এই দিকটি বিশেষ প্রাধান্য পাবে।

উত্তাপের হিসাবে জমা-খরচ

ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় সূর্যের বিকিরণ শোষণ করার মাধ্যমে। উত্তপ্ত হবার পর পৃথিবী নিজেও সে উত্তাপের খানিকটা বিকীর্ণ করে যে কোন উত্তপ্ত বস্তুর মত। পদার্থবিদ্যার একটি নিয়ম হলো একটি উত্তপ্ত বস্তু থেকে বিকিরণে কীরকম তরঙ্গদৈর্ঘ থাকবে তা নির্ভর করবে তার উত্তাপের উপর। উত্তাপ

যত বেশি, তরঙ্গদৈর্ঘের মিশ্রণে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ তত প্রকট হবে। যেমন কামার যখন লোহা গরম করে উত্তাপ বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে গরম হতে থাকা লোহা থেকে প্রথম বিকীর্ণ হয় বড় তরঙ্গদৈর্ঘের ইনফ্রা-রেড (তাপ), তারপর আরো উত্তপ্ত হলে কিছু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের দৃশ্যমান লাল আলো। তারপর আরো ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের নীল আলো যা আগেরগুলোর সঙ্গে মিশে সাদা আলো। সূর্যের যে বহির্ভাগের থেকে বিকিরণ ঘটছে তার উত্তাপ অনেক বেশি বলে এর বিকিরণে আলট্রা-ভায়োলেট ও দৃশ্যমান আলোর প্রাচুর্য থাকে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যখন বিকিরণ হয় তখন এর উত্তাপ সূর্যের তুলনায় অনেক অনেক কম বলে এর প্রায় পুরোটাই বিকীর্ণ হয় অধিক তরঙ্গদৈর্ঘের ইনফ্রারেড হিসাবে। কাজেই পৃথিবী সূর্যের কিরণ আলো ও তাপ সবভাবে পেলেও, এটি তা বিকীর্ণ করে শুধু তাপ বা ইনফ্রা-রেড হিসাবে যাকে বায়ুমন্ডলের কোন কোন গ্যাস বেশ ভালভাবেই শোষণ করে নিতে পারে। অথচ পৃথিবীর বুকে আসার সময় ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের কারণে বিকিরণ সেভাবে শোষিত হয়নি। পৃথিবীর তাপের জমা ও খরচের ক্ষেত্রে এভাবে বায়ুমন্ডলের ভূমিকা এক রকমের নয়।

বাস্তব উপাত্ত থেকে বিষয়টি দেখা যাক। গড়পড়তা হিসাবে বলা যায়-

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া

পৃথিবী ২৪০ একক হারে তাপ লাভ করে– অর্থাৎ প্রতি বর্গ মিটার জায়গার উপর ২৪০ ওয়াট তাপ। ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে ঐ পরিমাণ তাপই তার বিকীর্ণ করার কথা। তা যদি হয় তা হলে ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ হবার কথা –৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ বরফের গলনাংকের চেয়ে ৬ ডিগ্রি নিচে। কিন্তু আসলে ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ এর চেয়ে অনেক বেশি ১৫°সেলসিয়াস। এটি কেন? বায়ুমন্ডলের ঐ অসম ভূমিকাই এর কারণ। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি কিছু গ্যাস বায়ুমন্ডলে রয়েছে যাদের অণুর কম্পনহার বা আবর্তনহার পৃথিবীর বিকীর্ণ তাপের তরঙ্গদৈর্ঘের সঙ্গে এমন ভাবে মিলে যায় যে তা যে সব অণুতে কম্পন বা আবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। এর মানে ঐ গ্যাসগুলো এ তাপ কিছুটা শোষণ করে ফেলে, পুরোটা বাইরের দিকে যেতে দেয়না। এভাবে গ্যাসগুলো পৃথিবীকে ঘিরে একটি কম্বলের মত কাজ করে, তাপকে ধরে রেখে অনেকটা আবার পৃথিবীতেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। মেঘলা রাতের গরমেও আমরা বায়ুমন্ডলের এই 'কম্বলের' উপস্থিতি টের পাই। এই কারণেই ভূ-পৃষ্ঠের গড়পড়তা উত্তাপ - ৬° সে এর পরিবর্তে ১৫°সে। এই ১৫° সে কিন্তু একটি ভারসাম্যের অবস্থা, এ ভারসাম্য নষ্ট হলে এটি পরিবর্তিত হবে। যেমন বায়ুমন্ডলে শোষণকারী গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে একটি ভিন্ন ভারসাম্য সৃষ্টি হবে, এবং এ উত্তাপ বেড়ে যাবে। এখন তাই ঘটছে।

ভারসাম্যের বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত দেখা যাক। শেষ পর্যন্ত ভারসাম্যের জন্য যত তাপ এসেছে তত তাপই বাইরে চলে যেতে হবে। যেহেতু ভূপৃষ্ঠ থেকে সেই 'কম্বলের' জন্য সব তাপ যেতে পারবেনা, তাই বাকিটুকু যেতে হবে বায়ুমন্ডলের একেবারে উপরের দিকের স্তর থেকে যেখানে সেই 'কম্বল' বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা। শোষণকারী গ্যাস বাড়ার ফলে এই বাকিটুকুর পরিমাণ বাড়ে, যা যেতে হয় উপরের স্তর থেকে। কিন্তু উপরের স্তরের বায়ুমন্ডল অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল। উপরে উঠে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে বলেই এই শীতলতার সৃষ্টি হয়, পর্বত আরোহণের সময় এটি বেশ টের পাওয়া যায়। সাধারণ হিসাবে উপরের দিকে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতার জন্য ৬° সে উত্তাপ কমে যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে না গিয়ে উপরের যথেষ্ট শীতল স্তর থেকে বিকিরণ ঘটতে গিয়ে তাপের নির্গমন হবে বেশ কিছু কম। তারপরও ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে একটি পথই খোলা

থাকে, তা হলো ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ আগের থেকে বেড়ে যাওয়া। একটি সহজ হিসাবে দেখা যায় বায়ুমন্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড দ্বিগুণ হলে ওভাবে উত্তাপ নির্গমণ হার প্রতি বর্গ মিটারে ৪ ওয়াট কমে যায়। সেই পুরো ২৪০ ওয়াট তাপ নির্গমন করিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে তার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়তে হবে ১.২° সে। অবশ্য চক্রবৃদ্ধিসহ অন্য কিছু কারণে প্রকৃত উত্তাপ বৃদ্ধি হবে ২.৫° সে। স্পষ্টত: তাপ শোষণকারী গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি সরাসরি জড়িত। আরো খারাপ ব্যাপার হলো ঐ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে ওদের অণুর ঠোকাঠুকি বাড়ে বলে তাপ শোষণ আরো বেড়ে যায়।

গ্রীন হাউসের প্রক্রিয়া

উপরে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে আমরা গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া হিসেবেই জানি। এ নামটি এসেছে শীতের আবহাওয়ায় অধিকতর উষ্ণতা সৃষ্টি করে সব্জী বা অন্যান্য উদ্ভিদ ফলাবার জন্য যে কাচের ঘরের ব্যবস্থা থাকে তার অনুকরণে। গ্রীন হাউস নামে পরিচিত ঐ কাচের ঘরগুলোতে

আসল গ্রীন হাউস
কাচের আবরণ তাপের পরিচলন কমায়

কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের বিকিরণ ভেতরে চলে যেতে পারে। সাধারণত খোলা জায়গায় মাটি তাপ হারায় বাতাসের তাপের পরিচলনের ফলে। কিন্তু এক্ষেত্রে কাচের বাধার কারণে পরিচলনের পরিমাণ অনেক কমে যায়। যদিও কাচের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহন এবং কাচ থেকে বিকিরণের কারণে কিছু তাপ তখনো চলে যায়, তা সত্ত্বেও তাপের পরিচলন হ্রাস পাওয়ায় ভারসাম্যের অবস্থায় গ্রীন হাউসের ভেতরের উত্তাপ বাইরের থেকে বেশ খানিকটা উপরে থাকে। গ্রীন হাউসের ক্ষেত্রে উত্তাপ বৃদ্ধির প্রধান প্রক্রিয়াটি এরকমের। যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটে তার সঙ্গে গ্রীন হাউসের এ প্রক্রিয়া এক নয়। তবুও বাহ্যিক কিছু সাদৃশ্যের কারণে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া নামটি এসেছে, এবং বেশ চালুও হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও আমরা এই নামটি ব্যবহার করবো। তাপ শোষণকারী গ্যাসগুলোকে বলা হয় গ্রীন হাউস গ্যাস। সবার মত আমরাও তাই বলবো।

গ্রীন হাউস গ্যাস সমূহ

বায়ুমন্ডলে তাপ শোষণ করে ভূপৃষ্ঠের উপর 'কম্বলের' মত কাজ করে যে সব গ্যাস সেগুলোই গ্রীন হাউস গ্যাস। এদের আণবিক গঠনের কারণেই এই শোষণ ক্ষমতাটি দেখা দেয়। বায়ুমন্ডলের প্রধান দুটি গ্যাস নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের এই ক্ষমতাটি নাই। অন্যদিকে কার্বনডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও জলবিন্দু এবং ওজোন বায়ুমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণে থাকা তাপ শোষণকারী বস্তু (ওজোন অক্সিজেনে গড়া হলেও তিনটি অক্সিজেন পরমাণুতে গড়া এর অণুর গঠন ও আকৃতি অক্সিজেন গ্যাসের থেকে ভিন্ন)। অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে আছে মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, এবং সিএফসি। এসবের মধ্যে জলীয় বাষ্প ও জলবিন্দুর সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন দায়িত্ব নেই, গ্রীন হাউস গ্যাস হিসেবে তাই আমাদের কাছে এগুলো গুরুত্বহীন। অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব নির্ধারিত হয় নিম্ন লিখিত কয়েকটি দিক থেকে।

বায়ুমন্ডলে মানবসৃষ্ট উদ্গীরণে কোন্ গ্যাসটি কত বেশি সেটি একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে কার্বন-ডাই-অক্সাইড অন্য সব কটি থেকে অনেক

এগিয়ে রয়েছে। শিল্প কারখানা ও যানবাহন সহ যত ক্ষেত্রে কয়লা তেল গ্যাস ইত্যাদি ফসিল জ্বালানীর দহন ব্যবহৃত হয় সেগুলোতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণের সুযোগ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীন হাউস গ্যাসের জন্য বড় দায়ীদের অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের মোট উদ্গীরণের ৮৫% কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মাত্র ৮% মিথেন, ৫.৫% নাইট্রোজেন-অক্সাইড। অন্যান্য গ্যাসগুলোর উদ্গীরণ আরো অনেক কম।

কিন্তু শুধু উদ্গীরণের পরিমাণই একমাত্র বিবেচ্য নয়। তাপ শোষণ করে ভূপৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধির ক্ষমতার দিক থেকে এদের একটি অন্যটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় এই গ্যাসের একটি অণু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটি অণুর তুলনায় কত গুণ বেশি তাপ শোষণ করে তা দিয়ে। সেটিকে বলা হয় এর গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেনশিয়াল (জিডব্ল্যু-পি)– বিশ্ব-উত্তাপ বৃদ্ধি ক্ষমতা। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ক্ষেত্রে যেখানে এই পরিমাপ ১, মিথেনের তা ২১, নাইট্রোজেন অক্সাইডের তা ৩১০। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হওয়াতে কম শোষণ ক্ষমতা সত্ত্বেও এটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরো একটি দিক থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি ক্ষতিকর। সেটি হলো বায়ুমন্ডলে যাওয়ার পর এর অণু কতদিন তাপ শোষণের ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে– অর্থাৎ সেখানে এর আয়ুষ্কাল। একবার বায়ুমন্ডলে গেলে এরপর ৫০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সেখানে গ্রীন হাউস গ্যাস হিসেবে জমা থাকে। এর মানে হলো আজ এই গ্যাস যা উদ্গীর্ণ হচ্ছে তা ক্রম সঞ্চিত রূপে বর্তমান শতাব্দী ছাড়িয়েও হয়তো ক্ষতি করতে থাকবে। একবার উদ্গীরণের পর এর ক্ষতি নিরসণে আমাদের আর কিছু করার থাকেনা। আয়ুষ্কালের দিক থেকে মিথেন অনেক কম ক্ষতিকর– মাত্র ১২ বছর। কিন্তু নাইট্রোজেন অক্সাইডের ১২০ বছর আয়ুষ্কাল কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে তুলনীয়। সব কিছু এক সঙ্গে বিবেচনা করলে মিথেন ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড হচ্ছে বিশ্বজনীন ভাবে সবচেয়ে ক্ষতিকর গ্রীন হাউস গ্যাস এবং আমাদের আতঙ্কের বড় কারণ। আমাদের আলোচনায় আমরা একেই প্রধানত সামনে রাখবো।

বরফের পরতে পরতে ইতিহাস

এ কোন্ উত্তাপ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হলো ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি। দীর্ঘমেয়াদী পরিমাপে দেখা যায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উদগীরণ ৩০% এরও কম বাড়াতেই বিংশ শতাব্দীর এক'শ বছরে এই উত্তাপ বেড়েছে ০.৬°সে। এই সময়ে বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড যদি দ্বিগুণ হতো আমরা দেখেছি হিসাব অনুযায়ী এ উত্তাপ বাড়তো ১.২°সে। মনে হতে পারে এই সামান্য উত্তাপ বৃদ্ধি নিয়ে আমরা এত উদ্বিগ্ন হচ্ছি কেন? দিনের মধ্যেই তো উত্তাপ এর চেয়ে কত বেশি উঠানামা করে ১০° বেড়ে বা কমে যেতে পারে, কোন কোন দেশে আরো বেশি। তাছাড়া শীতের দেশে শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালের উত্তাপতো আরো অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাহলে ভাবনাটি কী নিয়ে? আসলে আমরা এখানে তাৎক্ষণিক উত্তাপের কথা ভাবছিনা, ভাবছি গড় উত্তাপ নিয়ে। দিনের ভেতর বা দিনে দিনে উত্তাপ যতই বাড়ুক কমুক, ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ কিন্তু ভারসাম্যেই থাকে। গ্রীন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির ঘটনায় এই গড় উত্তাপটিই ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। ভয়ের কারণ এখানেই। গড় উত্তাপ সামান্য বাড়ারও ফলশ্রুতি যে কী হতে পারে তা একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালে বার বার আসা বরফ যুগের সময় পৃথিবীর আবহাওয়া যখন চরম শৈত্যের দিকে চলে যায় তখন শীতের প্রকোপে জীবের অসংখ্য প্রজাতি বিলুপ্তই হয়ে যায়, অন্যদের ক্ষেত্রেও আসে নানা অঘটন, পরিবর্তন। এরকম যে বরফ যুগটি

শেষবার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছিল তার শীতলতম সময়টির গড় উত্তাপের চেয়ে আমাদের বর্তমান সময়ের গড় উত্তাপ মাত্র ২ বা ৩ ডিগ্রি বেশি!

এরপর থেকে যখনই আমরা বিশ্ব-উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণটি বলবো, মনে রাখতে হবে সেটি গড় উত্তাপের কথা বলছি। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে এ উত্তাপের যে অতীত তথ্য আমাদের রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে উত্তাপ মোটের উপর স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ঢুকার পর থেকে এতে বাড়ার প্রবণতা দেখা গেছে। এ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ১৯৫০ পর্যন্ত এটি বেড়েছে সামান্য পরিমাণে। তারপর ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছর কিছুটা কমেও গেছে। কিন্তু তারপরেই বৃদ্ধির গতি হয়েছে দ্রুততর এবং শেষ পর্যন্ত পুরো শতাব্দীতে বৃদ্ধির মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.৬°সে। আমরা আন্দাজ করতে পারি যে ফসিল জ্বালানীর ব্যবহারে ক্রম বৃদ্ধি এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তার অনেক বেশি বৃদ্ধি এভাবে উত্তাপকে বাড়িয়েছে। কিন্তু তাহলে ১৯৫০ এর পরের বিশ বছরে উত্তাপ নিম্নমুখী হলো কেন? মনে করা হচ্ছে এর কারণ বায়ুমন্ডলের অন্য কিছু দূষণ এ সময় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল যা বরং উত্তাপ কমাতেই সাহায্য করেছিল। এগুলো হলো সালফার কণা ও অন্যান্য দূষণ ধূলিকণা যা বায়ুমন্ডলকে আচ্ছন্ন করে সূর্যের আলোকে ঠিকরিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কম সৌর কিরণের ফলে উত্তাপও কমে যাচ্ছিল। কিন্তু এসব দূষণ সম্পর্কে পরিবেশ সচেতনতার ফলে ১৯৭০ এর পর এ দূষণ কমে গেলে আগের উত্তাপ বৃদ্ধিটি আরো বড় হারে ঘটার সুযোগ পায়। সত্তর বা আশির দশক থেকে গ্রীন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফল এত প্রকট ভাবে দেখা দিতে শুরু করেছে যে আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। এ সময় থেকে বিশ্বজোড়া উত্তাপ মাপার পদ্ধতিও অনেক উন্নত হয়েছে। ১৯৭০ এর পর থেকে উপগ্রহ থেকে একেবারে নিয়মিত ভাবে সারা পৃথিবীর উত্তাপ পরিমাপের কাজ সহজ হয়ে গেছে। এই পরিমাপের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ছাড়া আবহাওয়া বেলুনের পরিমাপ মিলিয়ে এক ডিগ্রির একশ'ভাগে তিনভাগ পর্যন্ত নিঁখুত পরিমাপ এখন পাওয়া যাচ্ছে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি

যখন থেকেই বিশ্ব-উত্তাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই ব্যাপারটিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণের ফল হিসাবে বুঝা গেছে। শিল্প বিপ্লব বেগবান হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী থেকে মানুষের নিজের কর্মকান্ড দ্বারা বেশি বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে যাওয়া আরম্ভ হয়েছে। এর মূল কারণ ফসিল জ্বালানী কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদির দহন। ফলে উন্নয়ন ও অর্থনীতির চাকা যতই ঘুরেছে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ততই বায়ু মণ্ডলে জমেছে, বিশ্ব-উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা ততই ঘনীভূত হয়েছে। কাজেই বিংশ শতাব্দীর উত্তাপ বৃদ্ধির হারকে এ সময় বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড যাওয়ার হারের সঙ্গে তুলনা করাটি খুব জরুরী।

বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ সরাসরি নিয়মিতভাবে মাপা আরম্ভ হয়েছে ১৯৫০ এর পর থেকে। তখন থেকে আমাদের কাছে এর উপাত্ত রয়েছে। ১৯৫৯ সালে হাওয়াই দ্বীপের মাউনা লোয়া পর্বতের উপর বসানো হয়েছে এর জন্য সব চেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্র। অনেক বেশি জিনিসের মধ্যে খুব অল্প জিনিসের পরিমাণ মাপতে সাধারণত যে একক ব্যবহার করা হয় তা হলো পিপিএম বা পার্ট পার মিলিয়ন (এক মিলিয়ন ভাগের মধ্যে যত ভাগ)। ১৯৭০ সালে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ ছিল ৩৩০ পিপিএম, ১৯৯০ সালে ৩৬০ পিপিএম, আর ২০০৭ সালে এসে এটি হয়ে ৩৮০ পিপিএম। কাজেই আধুনিক ফসিল জ্বালানী ভিত্তিক কার্যকলাপের ফলে এই গ্যাসের পরিমাণ যে বাড়ছে তা নিসন্দেহ। গত ৫০ বছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে প্রতি বছরে ১.৫ পিপিএম। এখন প্রশ্ন হলো এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কবে শুরু হয়েছিল? যেমনটি মনে করা হচ্ছে অতীতে যতদিন মানুষ ফসিল জ্বালানির ব্যবহার ব্যাপক আকারে শুরু করেনি, অর্থাৎ বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালু হওয়ার মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব যতদিন শুরু হয়নি ততদিন বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল– হাজার হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। যত বিপত্তির শুরু ঐ শিল্প বিপ্লব থেকে। এই ধারণা সঠিক কিনা জানার জন্য সুদূর অতীতে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ জানা থাকা চাই। তেমনি জানা থাকা চাই একই সময়ের ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপের

পরিমাণ- এতে বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়েছে কিনা দেখার জন্য। খুব বেশি অতীতে গিয়ে এর কোনটির সরাসরি পরিমাপ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে অভাব আমরা মিটিয়েছি অন্য ভাবে। সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তার আগে দেখি, যত কার্বন-ডাই-অক্সাইড আমরা জ্বালানির দহনে সৃষ্টি করছি তার সবটুকু বাতাসে যাচ্ছে কিনা।

যেতে নাহি দেব

উদ্গীর্ণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বায়ুমন্ডলে যেতে বাধা দেয়ার জন্য আমাদের দুটি বন্ধু রয়েছে- এক সমুদ্র, দুই উদ্ভিদরাজি। গত বছরগুলোতে প্রতি বছর বায়ুমন্ডলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়েছে, তা আরো অনেক বেশি হতো যদি না এই দুই বন্ধু এ গ্যাস শোষণ করে তা কিছুটা আটকিয়ে না রাখতো।

পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহজে দ্রবীভূত হয়। বিশাল সমুদ্র-পৃষ্ঠে তাই সব সময় বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এটি শুরুতে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে ঘটে বটে কিন্তু ধীরে ধীরে দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমুদ্রের গভীর পানিতে যায়। এভাবে এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরিয়ে ফেলার জন্য কার্যত একটি পাম্পের কাজ করে, যাকে বলা যেতে পারে দ্রবণ-পাম্প। আবার ঐ সমুদ্রেই একই সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরানোর আরো একটি পাম্প কাজ করছে, যাকে বলা যায় জৈব পাম্প। আগাগোড়া সমুদ্রের পানি অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন ও শৈবালে গিজ গিজ করছে। এরা সালোক সংশ্লেষণে খাদ্য তৈরির জন্য দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। সেভাবেও বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমুদ্রের মধ্যে আটকে থাকতে পারে।

সমুদ্রের ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ যা করে, স্থলের বিশাল উদ্ভিদরাজিও তাই করে– সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরিয়ে ফেলে। সালোক সংশ্লেষণ একে শর্করা খাদ্য তৈরির কাজে লাগায়। ফলে যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন শেষ পর্যন্ত গাছের দেহ গঠনে আটকে থাকে। অবশ্য উদ্ভিদের এই কার্বন আটকাবার ব্যাপারটি একেবারে নির্ভেজাল নয়। সালোক সংশ্লেষণ ছাড়া উদ্ভিদের শ্বসন প্রক্রিয়াও রয়েছে শক্তি তৈরির জন্য। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত এটি আবার যথেষ্ট কার্বন বাতাসে ফেরৎ দিয়ে

দেয় যা গ্রীন হাউস গ্যাসে অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া উদ্ভিদের ঝরা পাতা, মরা ডাল, মরা গাছ ইত্যাদি মাটিতে পঁচে নিত্য সার হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় তাতে প্রচুর মিথেন গ্যাস তৈরি হয়ে বাতাসে যাচ্ছে। গ্রীন হাউস গ্যাস হিসাবে মিথেনের ভূমিকা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরেই। এদিক থেকে সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদ নির্ভেজাল ভাবে গ্রীন হাউস গ্যাসের বিপক্ষে কাজ করেনা। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের বনভূমির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ যত গ্রীন হাউস গ্যাস আটকায় আর যতটি আবার তৈরি করে তার পার্থক্য খুব খুশি হবার মত নয়। আমরা এতদিন উদ্ভিদকে এই ব্যাপারে যতটা বাহবা দিচ্ছিলাম ততটি বাহবা হয়তো তার প্রাপ্য নয়। কিন্তু তারপরও মোটের উপর গাছপালার আচ্ছাদন এবং বনভূমির রক্ষা আমাদেরকে বেশ কিছু গ্রীন হাউস গ্যাস থেকে বাঁচাবে তা নিসন্দেহ।

সমুদ্র ও উদ্ভিদরাজি উভয়ের দিক থেকে মোট যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডল থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা হয় তার একটি মোটা হিসাবে নিলেই বুঝতে পারবো এরা কত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০ এর দশকে পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বার্ষিক উদ্গীরণ ঘটেছে ৬.৪ গিগাটন অর্থাৎ ৬৪০ কোটি টন। এর মধ্যে আমাদের ঐ দুই বন্ধু আটকে ফেলেছে ৩১০ কোটি টন। কাজেই আসলে মাত্র ৩৩০ কোটি টন গ্রীন হাউস গ্যাস হতে পেরেছে - বাকী প্রায় অর্ধেকটাই আটকে দিয়েছে ঐ দুই বন্ধু। চিন্তা করা যাক এরা না থাকলে কী হতো!

আইসকোর ঃ গভীর বরফের সরু স্তম্ভ

ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ সম্পর্কে পরিমাপ রয়েছে দেড়শ' দু'শ বছরের বেশি নয়। আর বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ নিয়মিত মাপতে পারছি মাত্র ৬০ বছরের মত সময় ধরে। এদের প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টির নির্ভশীলতা শিল্প বিপ্লবের শুরুর সময় থেকে দেখাতে হলে আমাদের সে সময়ের তথ্য দরকার। সে তথ্য কোথায় পাব? এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে মেরু অঞ্চলে যুগযুগ ধরে জমা বরফ।

আইসকোরের জন্য খনন

উভয় মেরু অঞ্চলে এবং আরো কিছু জায়গায় প্রতি বছর শীতে বরফ পড়ে কিন্তু গ্রীষ্মের উত্তাপে সব বরফ গলেনা। কাজেই বছরের পর বছর বরফ সেখানে জমতেই থাকে– গড়ে উঠে পূঞ্জীভূত জমাটবাঁধা বরফের উচ্চতা। প্রতিবছরের বরফ এতে সৃষ্টি করে একটি স্তর, এভাবে যত বছর তত স্তর– শত শত এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে। এই বরফের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে ঐ বিভিন্ন বছরগুলোর জলবায়ু এবং বায়ুমন্ডল পরিস্থিতির অনেক তথ্য, যদি আমরা সে সব তথ্য পড়তে পারি। এই ইতিহাস পড়ার সক্ষমতাই আমাদেরকে এনে দিয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলো থেকে সুদূর অতীত পর্যন্ত বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির পরিমাণ ও সেই সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপের খবর। এই বরফই এভাবে সুযোগ করে দিয়েছে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের আন্দাজটি কতখানি সত্য তা প্রমাণের। শুধু তাই নয়, শিল্প বিপ্লব শুরুর বহু আগে, সুদূর অতীতে পরিস্থিতি কী রকম ছিল তাও।

পুরানো এসব তথ্য উদ্ধারের বিজ্ঞানটি হচ্ছে সাম্প্রতিক আইসকোর ভিত্তিক গবেষণা। এতে জমাট বরফের মধ্যে নলকূপ বসাবার মতো করে খুঁড়ে সরু

খুঁড়ে তোলার পর আইস-কোর বের করে নেয়া

নিরবিচ্ছিন্ন স্তম্ভের আকৃতির বরফ তুলে আনা হয়- এটিই আইসকোর। প্রধানত গ্রীনল্যান্ড ও আন্টার্কটিকার নানা অঞ্চলের গভীর চির-বরফের সঞ্চয় থেকে এভাবে আইসকোর তুলে আনা হয়। গভীরতা অনুযায়ী আইসকোর অনেক দীর্ঘ হতে পারে। তবে স্থানান্তর, সংরক্ষণ ও কাজের সুবিধার জন্য একে মিটার খানেক লম্বা অংশে কেটে কেটে রাখা হয়– কোনটির নিচে কোনটি ছিল তা চিহ্নিত করে। এগুলোকে প্রায় সমান একই আকৃতির ধাতব টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে সুরক্ষা দেয়া হয়। আইসকোর খনন করে তোলা, একে অবিকৃত রেখে কোন রকম দূষণ ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষার জন্য দূরবর্তী ল্যাবোরেটরিতে পাঠানো, দীর্ঘদিনের সংরক্ষণের জন্য শীতল লাইব্রেরীর মত ঘরে তাকে তাকে সংরক্ষণ করা, সহজ কাজ নয়। সব কিছু করতে হয় যথেষ্ট ঠান্ডার মধ্যে ধূলা বালি ও বাতাসের অন্যান্য দূষণ থেকে দূরে রেখে।

আইসকোরের মধ্যে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি থাকে পাতলা এক একটি স্তরের মধ্যে যা এক একটি বছরের প্রতিনিধিত্ব করছে। ঐ স্তরটি পরীক্ষা করে তাঁরা ঐ বছরটির তথ্য জানতে পারেন। পুরো আইসকোরের সব চেয়ে উপরের স্তরটি হলো গত বছরের জমা বরফ। তার নিচেরটি এর আগের বছরের, এভাবে আরো নিচে অতীতের বছরগুলোর। নিচের দিকের স্তরগুলো উপরের স্তরের চাপে ঘনসংবদ্ধ ও পাতলা হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরও এক একটি স্তরকে চিহ্নিত করে তার উপর পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়েছে। এভাবে

আইসকোর সংরক্ষণাগারে
হাজার হাজার বছরের জলবায়ু তথ্য

হাজার হাজার বছরের তথ্য জানা যায়। গভীরতম যে রকম পূঞ্জীভূত বরফ থেকে আইসকোর তুলে আনা হয়েছে তা সাড়ে তিন কিলোমিটার পুরু, আর এর একেবারে তলার স্তরগুলো চার লক্ষ বছর পুরানো।

বরফের ভাষায় অতীতের তথ্য

আইসকোরে বরফের স্তরগুলোর মধ্যে তখনকার আবহাওয়া ও পরিবেশ সম্পর্কে চিহ্ন থেকে যায়। এটি অনেকটা গাছের গুড়ির পর পর রিংগুলোর মধ্যে অথবা সমুদ্রতলের পর পর পলি-স্তরে পাওয়া চিহ্নের সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বছর বৃদ্ধির মৌসুমে গাছের গুড়ির সঙ্গে একটি নূতন অংশ যোগ হয় যা গুড়ির কর্তিত তলে একটি নূতন রিং হিসেবে দেখা যায়। ঐ রিংএর আকার আকৃতি, রং, বিকৃতি ইত্যাদি দেখে ঐ সময়ের আবহাওয়া ও

পরিবেশ জনিত অনেক খবর পাওয়া যায়। রিংগুলোর ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী কোন্ রিং কোন্ বছরের, গাছের বয়সটাই বা কী ইত্যাদিও বুঝা যায়। আরো দীর্ঘকালীন অতীতের জন্য বিজ্ঞানীরা সমুদ্র তলে বছর বছর জমা পলিস্তরের অবস্থাও পরীক্ষা করেন। জমা বরফের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনেকটা সে রকম। বিশেষ করে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার বাড়া-কমার ব্যাপারগুলোর তথ্য পাওয়ার জন্য এটি চমৎকারভাবে উপযোগী। এ যেন বিষয়টির পুরো ইতিহাস বরফের ভাষায় লিখে আমাদের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। দেখা যাক এই লেখাটি কী রকমের।

বরফ জমার সময় তাতে কিছু কিছু বুদবুদ থেকে যায়- যার মধ্যে সে সময়কার বাতাস স্থায়ীভাবে আটকা পড়ে যায়। ঐ সামান্য পরিমাণ বাতাসও আজকের উন্নত ম্যাস-স্পেকট্রোস্কোপি প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ

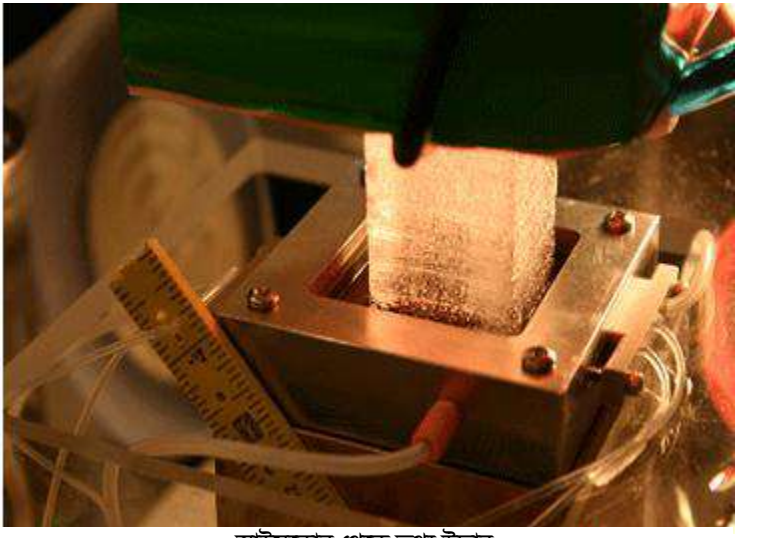

আইসকোর থেকে তথ্য উদ্ধার
সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরিমাপ

নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বছরে এই গ্যাস কতখানি বেড়েছে বা কমেছে তা জানতে পারছি দু'এক বছরের নয়– শত শত, হাজার হাজার বছর ধরে। একই সঙ্গে যদি ঐ একই সময়ের উত্তাপ

জানা সম্ভব হয় তা হলে উভয়ের বাড়াকমার মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা তাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

ঐ বছর বা ঐ মৌসুমের সময় পরিবেশে উত্তাপ কী ছিল তা বরফ থেকে উদ্ঘাটন করার চমৎকার পদ্ধতি রয়েছে। যে পানি জমাট বেঁধে বরফ হয় তার আণবিক গঠনে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়েরই একাধিক আইসোটোপ রয়েছে। আইসোটোপ মানে হলো একই মৌল অথচ তার নানা প্রকারভেদের পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যার হেরফেরে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশি ভারি হওয়া। এভাবে সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে সব সময় সুনির্দিষ্ট স্বল্প অনুপাতে কিছু ভারি হাইড্রোজেন থাকে। অক্সিজেনের ক্ষেত্রেও তাই। পানি বা বরফের মধ্যে তাই কিছু ভারি পানির অণুও থাকে। পানি জমাট বেঁধে বরফ হবার সময় পরিবেশের উত্তাপ তুলনামূলক ভাবে কম হলে জমাট হবার ক্ষেত্রে সাধারণ পানির চেয়ে ভারী পানির অণুগুলোই কিছুটা অগ্রাধিকার পাবে। এর কারণ ভারী পানির বাষ্পচাপ তুলনামূলকভাবে কম। কম বাষ্পচাপে দশা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপটিও কম। ফলে বরফে ভারী আইসোটোপের অনুপাত মেপে বরফ জমাট বাঁধার সময়কার উত্তাপটি বের করে ফেলা যায়। এ যেন বরফের পরতে পরতে রেখে দেয়া আছে উত্তাপ মাপার ও রেকর্ড করে রাখার একটি চমৎকার থার্মোমিটার। অবশ্য এই উত্তাপ ভূ-পৃষ্ঠের উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের উত্তাপ– কারণ আইসকোর সেখানেই সংগৃহীত। তবে আমাদের জানা রয়েছে যে মেরু অঞ্চলের গড় উত্তাপ হ্রাসবৃদ্ধিকে ভূ-পৃষ্ঠের সামগ্রিক গড় উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধির অর্ধেক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সেই সঙ্গে একই স্তরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণে পরিবর্তন এবং গড় উত্তাপের পরিবর্তন এভাবে বছর বছর পাওয়া গেলে এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে আর বাধা কোথায়?

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যে আপাতত উল্লিখিত তথ্যগুলোই বেশি প্রয়োজনীয় হলেও আইসকোর কিন্তু শুধু এ তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হয়না। ঐ বুদবুদের মধ্যে আটকা পড়ে সে সময়ের বাতাসের ধূলিকণা, কাছাকাছি কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে তার ভস্ম, উদ্ভিদের ক্ষুদ্র অংশ, কোথাও তেজস্ক্রিয়তা থাকলে তার কণিকা ইত্যাদি। এভাবে আইসকোর

থেকে বায়ুমন্ডলের উত্তাপ, গ্যাস, তুষার পাতের হার, অগ্ন্যুৎপাত, উদ্ভিদ, সূর্যকিরণের পরিমাণ, তেজষ্ক্রিয়তা– ইত্যাদি পরিবেশের বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়া যায়– সুদূর অতীত কালেরও। এত কষ্ট করে, এত সতর্কতার সঙ্গে, দুর্গম জায়গা থেকে খনন করে আইসকোর সংগ্রহ, স্থানান্তর, সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও সংরক্ষণ যে করা হয় তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বৈকি। ল্যাবোরেটরিতে আইসকোরের প্রাসঙ্গিক অংশ থেকে ছোট একটি টুকরা কেটে নেয়া হয় পরীক্ষা করার জন্য। তারপর শক্তিশালী অনুবীক্ষণ, ম্যাস স্পেকট্রোমিটার ইত্যাদির মাধ্যমে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা হয়।

একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আইসকোরের মধ্যে কোন স্তরের বা অংশের বয়স নির্ভুল ভাবে জানার উপায় কী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জমা উপরের দিকের বরফের স্তরগুলো খুব স্পষ্টভাবে আলাদা করা সম্ভব – স্তরগুলো অপেক্ষাকৃত পুরু ও সুস্পষ্ট বলে। কিন্তু যতই নিচের দিকে অর্থাৎ অতীতের দিকে যাব স্তরগুলো ততই উপরের চাপের কারণে একটি আর একটির সঙ্গে লেপটে থাকবে এবং আলাদা করা ততই দুরূহ হবে। তা সত্ত্বেও এগুলোকে আলাদা করার সূক্ষ্ম উপায় রয়েছে। কিন্তু বিপত্তি বাধে শত শত বছর বা হাজার বছর অতীতের ক্ষেত্রে। এদের গভীর স্তরের উপর উপরের সব স্তরের এত প্রচন্ড চাপ থাকে যে তা রীতিমত প্রবাহিত হতে শুরু করে এরকম চাপে কঠিন পদার্থের প্রবাহের মত– যেমন হিমবাহ প্রবাহিত হয়। তখন স্তর চিহ্নগুলো একেবারেই খুঁজে পাওয়া যায়না। তবে কত নিচে থাকলে অর্থাৎ কত চাপে থাকলে এই প্রবাহের ধরন কী হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তাই প্রবাহের ধরন পরীক্ষা করে এক্ষেত্রেও বলা যায় একটি নির্দিষ্ট অংশ কত স্তর নিচের অংশ। এভাবে অনেক অতীতের সময়-কালটিও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে– আর সেই সঙ্গে তখনকার আবহাওয়া ও পরিবেশ চিত্র।

আইসকোর কী বলছে?

আইসকোর থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৮ হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময় বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ২৮০ পিপিএমএ প্রায় স্থির থেকেছে। এরপর পরিমাণ আশ্চর্যজনক ভাবে বাড়তে আরম্ভ করেছে এবং বৃদ্ধির হার ক্রমশ দ্রুততর হয়েছে। ২০০৭ সালে এটি এসে দাঁড়িয়েছে ৩৮০ পিপিএম- অর্থাৎ ২০০ বছরে বৃদ্ধির

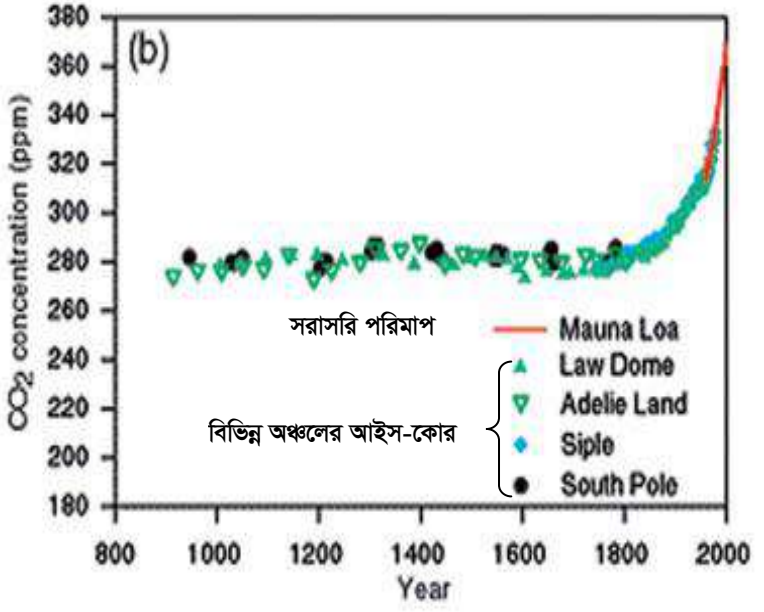

গত এক হাজার বছর বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড

পরিমাণ প্রায় ৩০%। এখানে দেয়া লেখচিত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথম চিত্রটিতে গত এক হাজার বছরের কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এতে শুধু গত ৫০ বছরের পরিমাপে আইসকোর তথ্যের সঙ্গে মাউনা লোয়া পরিমাপ কেন্দ্র থেকে পাওয়া সরাসরি পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - যা রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। বাকি সব তথ্য বিভিন্ন স্থান থেকে তোলা আইসকোরের। স্থান বিশেষের আইসকোর থেকে পাওয়া উপাত্ত বিন্দু হিসাবে ত্রিভুজ, উল্টা ত্রিভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার

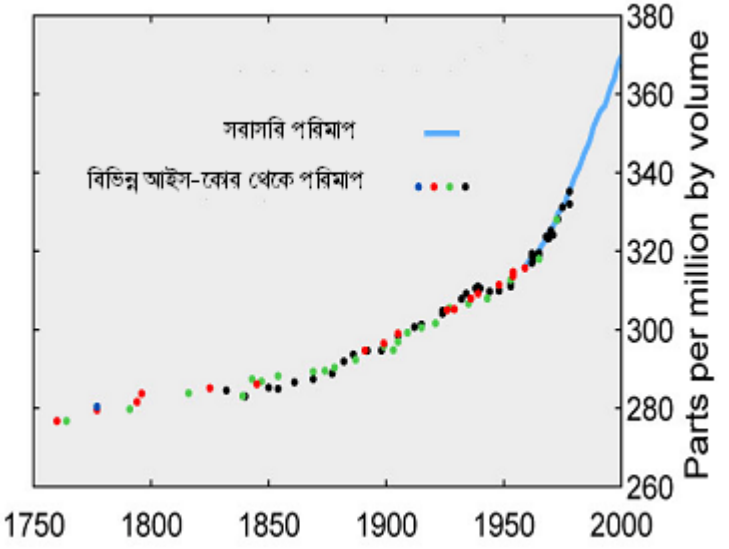

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি

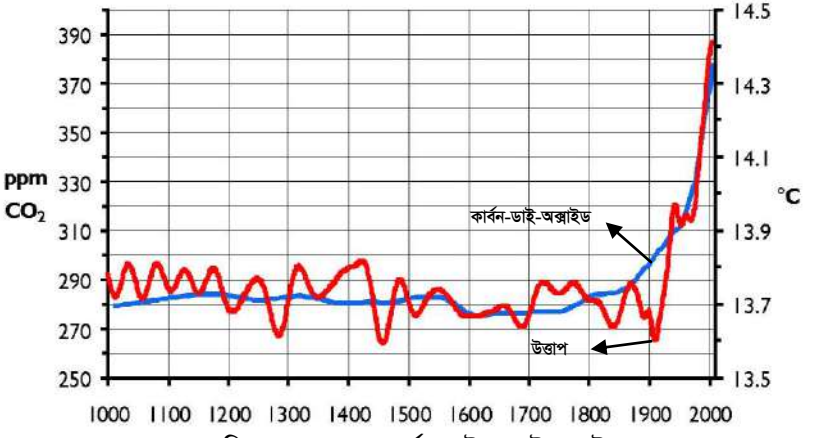

পাশাপাশি ১০০০ বছরের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও উত্তাপ তথ্য
(১০০০ সাল থেকে ২০০০ সাল)

করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব চিহ্নই মোটামুটি একাকার হয়ে দেখাচ্ছে কেমন করে ১৮০০ সাল নাগাদ পর্যন্ত প্রায় একই ২৮০ পিপিএম

থাকার পরে এটি দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করেছে। শিল্প বিপ্লবের উদ্গীরণ জনিত কারণের ছাপ এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় সৃষ্ট চরম পরিস্থিতির ছাপ এখানে স্পষ্ট। দ্বিতীয় লেখচিত্রে এই বাড়ার অংশটি আরো স্পষ্ট করা হয়েছে ১৭৫০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তথ্য দিয়ে। দেখা যাচ্ছে কী ভাবে ১৯৫০ এর দিকে এসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির হার অনেক খানি বেড়ে গেছে, এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ ও ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ–আইসকোর থেকে পাওয়া এই উভয় তথ্যই গত এক হাজার বছরের জন্য আমরা পাশাপাশি রেখে দেখতে পারি– যা সর্বনিম্ন লেখচিত্রে দেখতে পাচ্ছি। উত্তাপের রেখায় বেশ কিছু উঠানামা আছে যেটি স্বাভাবিক, কারণ বিভিন্ন মৌসুমে এবং বছরেও কিছু কিছু উঠানামা থাকবেই। কিন্তু তারপরও এই উঠানামার মধ্যবিন্দুকে অনুসরণ করে গেলে গড় প্রবণতাটি খুবই স্পষ্ট – তা কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণের বাড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছে। এখানেও দেখছি হাজার বছরের ইতিহাসে ১৮০০ সাল নাগাদ পর্যন্ত গড় উত্তাপ মোটামুটি ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে স্থিতিশীল, তারপর দ্রুত গতিতে বেড়ে এখন প্রায় ১৪.৪ ডিগ্রিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ে বৃদ্ধি প্রায় ০.৬°সে। আগেই বলেছি এই বৃদ্ধি আপাত দৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও এর তাৎপর্য অনেক।

জগদ্দল বরফ ভাঙ্গছে, গল্‌ছে

জমা বরফের যোগ-বিয়োগ

বিশ্ব-উষ্ণতা বৃদ্ধির অশনি সংকেত সব চেয়ে নাটকীয়ভাবে দেখা দিচ্ছে উত্তরে আর্কটিক আর দক্ষিণে আন্টার্কটিকে বহুকাল সঞ্চিত জমাট বরফের দ্রুত অবক্ষয়ের মাধ্যমে। গত কয়েক বছর ধরে এই অবক্ষয় হঠাৎ অনেক

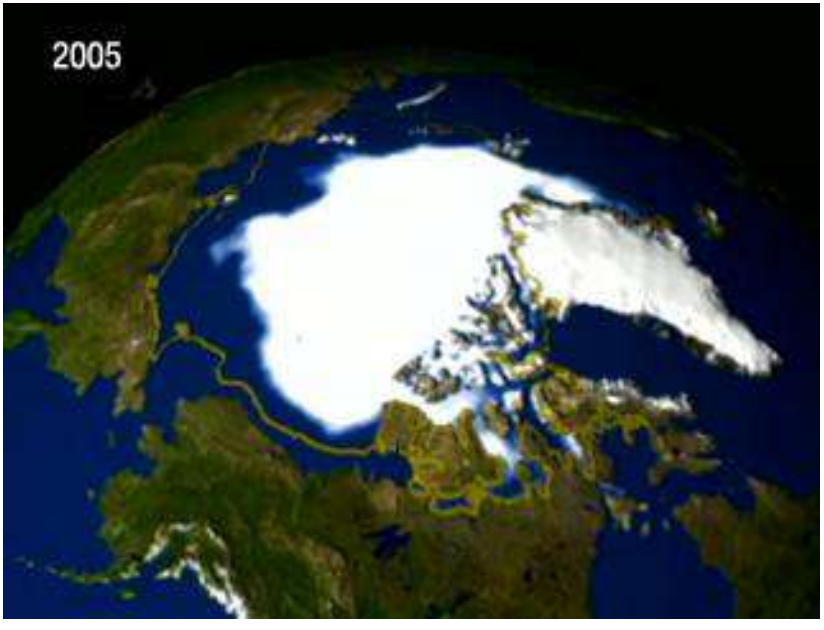

২০০৫ এ তোলা উপগ্রহ-চিত্রে ধরা পড়ছে আর্কটিক অঞ্চলের বরফ হ্রাস

বেশি বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এটি যদি একটি দীর্ঘতর প্রবণতার লক্ষণ হয়, তা হলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাগুলো যে ক্রমেই দ্রুততর গতিতে ঘটতে থাকবে এটি তারই পূর্বাভাস। এই বরফ গলার প্রধান সরাসরি ফলশ্রুতি হচ্ছে- বিপুল পরিমাণ বরফ-গলা পানি নূতন করে সমুদ্রে যাওয়াতে বছর বছর সমুদ্রপৃষ্ঠ আশঙ্কাজনক ভাবে উঁচু হতে থাকবে। সুদূর মেরু অঞ্চলে যা ঘটছে তা চলতে থাকলে এর প্রভাব বাংলাদেশের অনেক নিচু অঞ্চলকে পানিতে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য যথেষ্ট। আর বরফ গলে যাবার হার দ্রুত বেড়ে যদি শুধু গ্রীনল্যান্ডের পুরো জমা বরফ পানিতে যাবার মত অবস্থা যদি কোনদিন হয় তা হলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৭/৮ মিটার বেড়ে অকল্পনীয় ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে পৃথিবীর নানা জায়গায়।

বেশ কিছু বছর হলো উপগ্রহের মাধ্যমে আর্কটিক অঞ্চলের (ও অন্যত্রের) জমাট বরফের উপর সব সময় নজর রাখা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফের স্তুপ গত কয়েক দশক ধরে প্রতি দশকে ৯% হারে কমে যাচ্ছে। ২০০২ সালে একে আরো নাটকীয় ভাবে কমে যেতে দেখা যায়। এরপর থেকে কমার ঐ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এখানে দেখানো ২০০৫ সালের উপগ্রহ ছবিতে ব্যাপারটি ধরা পড়ছে। আর্কটিকের এই দৃশ্য প্রচুর গুরুত্ব বহন করে, কারণ এই অঞ্চলটিকে বিশ্ব-উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল একটি এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয়। অনেকে মনে করছেন এই প্রবণতা চলতে থাকলে বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ গিয়ে গ্রীষ্মকালে আর্কটিক অঞ্চল সম্পূর্ণ বরফশূন্য হয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকবেনা। একই ঘটনা অবশ্য আন্টার্কটিকায় এবং দুই মেরু অঞ্চলের বাইরে অন্যত্রও ঘটছে।

এসব জায়গায় জমাট বাঁধা বরফ এসেছে কোথা থেকে? প্রতি বছর পৃথিবীর সকল জলভাগ থেকে যে বিপুল পরিমাণে পানি বাষ্পীভূত হয় তার একটি বড় অংশ তুষারপাত হিসাবে মেরু অঞ্চলে ও অন্যত্র বরফ জমায়। এর প্রধান সঞ্চয় রয়েছে আর্কটিক মেরু টুপি, গ্রীনল্যান্ডসহ আর্কটিক অঞ্চল, আন্টার্কটিকের বরফের চাদর, আর এসব অঞ্চল ও পৃথিবীর নানা অংশে অনেক হিমবাহে। প্রতি বছর নূতন যত বরফ জমছে গ্রীষ্মে প্রায় তার সমপরিমাণ বরফ এসব জায়গার সমুদ্র উপকূল থেকে গলে গিয়ে অথবা ভেঙ্গে পানিতে ভাসা হিমশৈল থেকে আবার পানি হিসাবে জলভাগেই ফেরৎ

যায়। এর ফলে জমা খরচের ভারসাম্যে জমা বরফের পরিমাণ মোটামুটি একই থেকে যায়। পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের আদি ইতিহাসে অতীতের বরফ যুগ থেকে জমা বিপুল বরফের পুরানো পুঁজিতে হাত পড়েনা। ওটা থেকে যায় পৃথিবীর বিপুল পানিকে জগদ্দল বরফ হিসাবে চিরতরে আটকিয়ে রেখে। তবে এর উপরে কোন বছর বরফের জমার পরিমাণ খরচের চেয়ে বেশি হলে মোট জমাট বরফের ভর (ম্যাস) কিছুটা বেড়ে যায়। আবার কখনো জমার তুলনায় খরচ বেশি হলে সেই ভর কমে যায়। জমাখরচের পর থেকে যাওয়া ভরকে বলা হয় ম্যাস ব্যালেন্স। জমা ও খরচ একই হলে ম্যাস ব্যালেন্স অপরিবর্তিত থেকে যায়– এবং সেটিই মোটামুটি সব সময় হয়ে আসছিল। এখন আশঙ্কার কারণ হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ম্যাস ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, এবং এই কমার গতি দ্রুততর হচ্ছে। এর ফলে জমা বরফের পুঁজিতে টান পড়ে এটি নিঃশেষ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা।

ম্যাস ব্যালেন্স মাপার জন্য সরাসরি বরফের মধ্যেই কিছু পরিমাপ যন্ত্র স্থাপন করা হয়– যেমন আর্কটিক বরফের নানা জায়গায়। এতে শব্দ

বয়াতে স্থাপিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রে
ম্যাস ব্যালেন্স তথ্য রেকর্ড

শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে
উপরিতল নির্ণয়

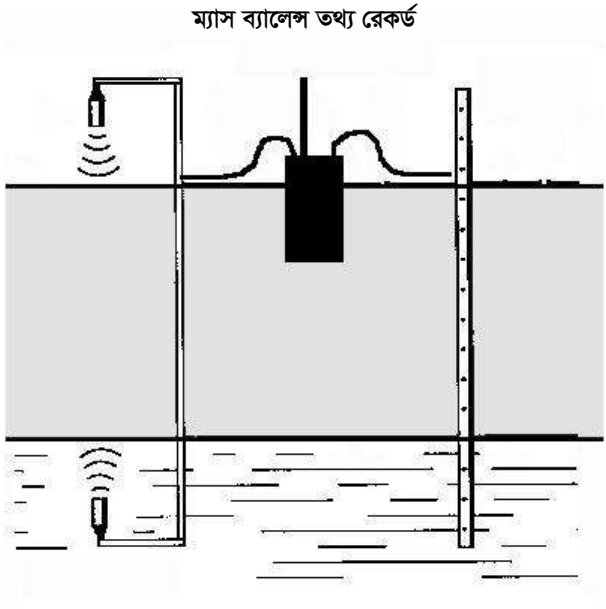

শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে
তলদেশ নির্ণয়

সমুদ্রে বরফের ম্যাস ব্যালেন্স রেকর্ড

তরঙ্গের প্রতিফলন দেখে বরফের উপরিতল এবং নিম্নতলের অবস্থান নির্ণয় করা হয় এবং তার থেকে সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাৎক্ষণিক ম্যাস ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়। সমুদ্রে ভাসমান বরফের ক্ষেত্রে এটি পরিমাপের অন্যান্য ব্যবস্থাও রয়েছে। এর একটি হলো গ্র্যাভিটি রিকভারি এ্যান্ড ক্লাইমেট এক্সপেরিমেন্ট বা সংক্ষেপে গ্রেইস নামের ব্যবস্থা। এতে ভূ-পৃষ্ঠের ৫০০ কিলোমিটার উপর দিয়ে দুটি উপগ্রহ একটির সামান্য পেছনে অন্যটি– এভাবে ভূপ্রদক্ষিণ করছে। উভয় উপগ্রহের মধ্যে দূরত্ব প্রতিনিয়ত পরস্পর মাইক্রোওয়েভ বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হচ্ছে। কখনো যদি সামনের উপগ্রহের উপর তার তলার ভূখন্ডের মাধ্যাকর্ষণ টানের চাইতে পেছনের উপগ্রহের উপর তার তলার ভূখন্ডের টান কিঞ্চিৎ কমবেশি হয় তার ফলে উভয়ের মধ্যে দূরত্বেরও হেরফের হয় যার থেকে ঐ টানের পার্থক্যটি সূক্ষ্মভাবে নির্ণিত হয়। বরফ অবস্থায় থাকা বা গলে পানি হয়ে যাওয়ার কারণে ভূখন্ডের ঐ টানের

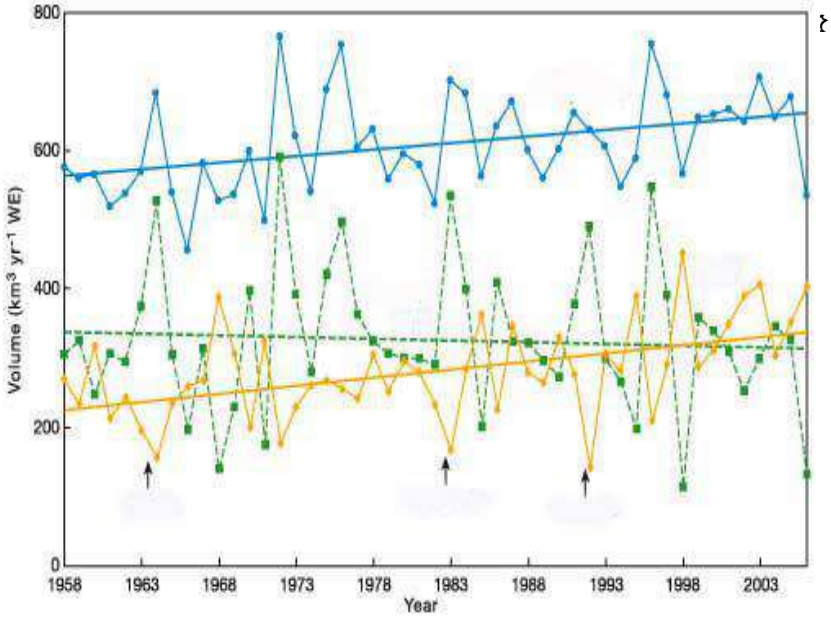

তুষারপাত বৃদ্ধি, বরফগলা বৃদ্ধি, ম্যাস ব্যালান্স হ্রাস

পার্থক্য হতে পারে। এভাবে উপগ্রহ দুটি নিচের ভূ-পৃষ্ঠের একটি মাধ্যাকর্ষণ মানচিত্র তৈরি করে চলছে সবসময়। এই মানচিত্র থেকে বুঝা যায় বরফ কত জমে রইলো বা কত গলে পানি হয়ে কোথায় কীভাবে প্রবাহিত হলো তা। উদাহরণ স্বরূপ এই গ্রেইস পদ্ধতিতেই বুঝা গেছে যে ২০০৭ এর গ্রীষ্মে শুধু গ্রীণল্যান্ডের ম্যাস ব্যালেন্স থেকে ৫০ হাজার কোটি টন বরফ হারিয়ে গেছে গলে পানি হয়ে। এটি এর আগের বছর থেকে ৩০% বেশি। বলা বাহুল্য এই অতিরিক্ত পানি পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়াতেই কাজে লাগছে।

এখানে দেখানো লেখচিত্রে ১৯৫৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে তুষারপাত অর্থাৎ বরফের জমা, বরফ গলা অর্থাৎ বরফের খরচ, এবং ম্যাস ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে একই সঙ্গে তিনটি পৃথক রেখায়। সব ক'টির ক্ষেত্রে বছর থেকে বছরে উঠা নামা রয়েছে, তবে মোটের উপর প্রবণতাকে একটি সরল রেখায় দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে তুষারপাত বেড়েছে, অবশ্য সেই সঙ্গে বরফ গলাও বেড়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টির বাড়া প্রথমটির চেয়ে দ্রুততর হারে ঘটেছে বলে

ম্যাস ব্যালেন্স ক্রমশ কমে গেছে। এই কমে যাওয়াটাই আমরা এখন আশঙ্কাজনকভাবে আরো দ্রুততর হতে দেখছি। এখানে একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করার মত– বরফ গলার হার ক্রমে বেড়ে চললেও কোন কোন বছর বিশেষ বিশেষ আগ্নেয়গিরির বড় অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনার প্রভাবে (তীর দিয়ে দেখানো) তা প্রচুর কমেও যেতে দেখা যাচ্ছে - উদ্গীর্ণ ভস্ম ইত্যাদি সূর্যকে ঢেকে ফেলে মেরু অঞ্চলে উত্তাপ সাময়িক ভাবে কমিয়ে দিয়েছিল বলে। তুষার জমার তুলনায় বরফ গলার এই প্রবণতা আর্কটিক, আন্টার্কটিক এবং পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চ স্থানে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। যেমন শেষোক্ত ক্ষেত্রে সুইস আল্পসে যাঁরা স্কী করতে যান তাঁরা দেখছেন প্রতি বছর স্কী করার মত বরফ পেতে ক্রমেই আল্পসের আরো উচ্চ-স্থানে চলে যেতে হচ্ছে।

হিমবাহের এগুনো পিছুনো

পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক গঠনে হিমবাহের একটি বড় গুরুত্ব রয়েছে। গত বরফ যুগে এসব হিমবাহ নেমে এসেছিল বর্তমান অনেক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল পর্যন্তও। আজ এরা উত্তরে ও দক্ষিণে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি ও পর্বতাঞ্চলে সরে গেছে বটে কিন্তু সেখানে বছরের পর বছর অপরিবর্তিত

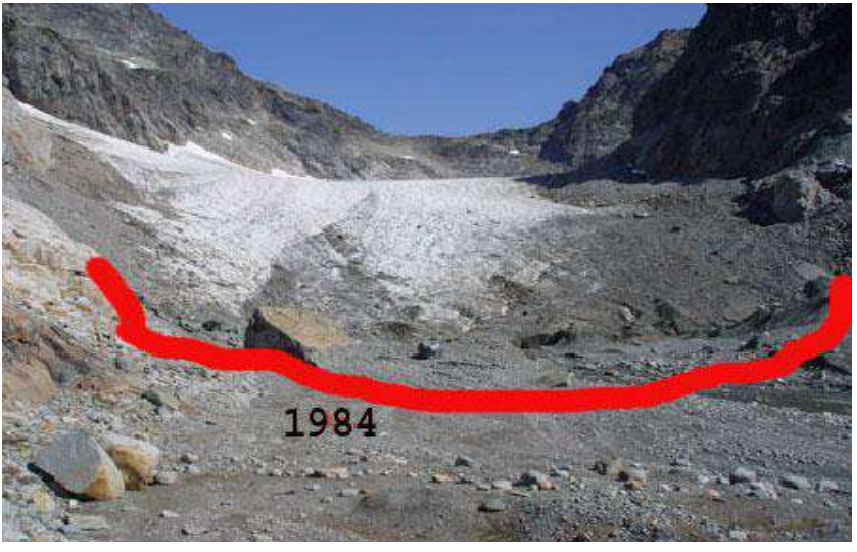

হিমবাহের পশ্চাদপসরণ
১৯৮৪ থেকে ২০০৫

জগদ্দল বরফ হিসাবে থেকে গেছে। হিমবাহ মানেই হলো এই কঠিন জগদ্দল বরফের প্রবাহ, প্রচন্ড চাপের কারণে যেটি খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে পারে নদীর মত। এখন যেটি লক্ষ্যণীয় সাম্প্রতিক বিশ্ব-উত্তাপ বৃদ্ধির প্রভাবে এই হিমবাহের কী হচ্ছে। বা উল্টো করে বল্লে হিমবাহের অবস্থা দেখে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কী গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারছি।

সুদূর অতীতে বরফ যুগের অবসানে যেভাবে হিমবাহ উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে অথবা পর্বতের আরো উপরে সরে গেছে তার কিছুটা অনুরূপ ঘটনা দেখা যাচ্ছে গত বেশ কয়েক দশক ধরে। উত্তাপ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হিমবাহ স্পষ্টত: পশ্চাদপসরণ করছে। আবার যেখানে জমাট বরফ সমুদ্র উপকূল ছুঁয়ে গেছে– যেমন গ্রীনল্যান্ডে– সেখানে হিমবাহের এগিয়ে যাওয়াটাই বরফ গলে সমুদ্রের পানিতে বিলীন হবার সুযোগ করে দিচ্ছে। রাডারের মাধ্যমে পরিমাপে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ গ্রীনল্যান্ডে হিমবাহগুলো এখন আগের থেকে অনেক বেশি হারে সমুদ্রের পানিতে বরফ ছেড়ে দিয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে। অর্থাৎ এদের বরফ প্রবাহের গতি বেড়ে গেছে অনেক খানি।

গ্রীনল্যান্ডে সব চেয়ে বড় হিমবাহ জেকবসন ইসব্রী দ্বীপটির পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। গ্রেইস উপগ্রহগুলোর এবং অন্যান্য পরিমাপে দেখা যাচ্ছে ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে এর গতি বছরে ৫.৭ কিলোমিটার থেকে বেড়ে বছরে ১২.৬ কিলোমিটারে গিয়ে পৌঁছেছে। এক দশক আগেও এভাবে হিমবাহের গতি দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। এখন এটি ঘটছে, ব্যাপারটি রীতিমত নাটকীয়। এভাবে দ্রুততর হিমবাহ প্রবাহের অর্থ হলো অধিকতর বরফের সমুদ্রে যাওয়া, এবং তার ফলে এই হিমবাহের উৎস যেখানে সেই কেন্দ্রীয় বরফ-চাদরের ক্রমে পাতলা হয়ে পড়া। গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে আরো দুটি প্রধান হিমবাহে এভাবে সম্প্রতি দ্রুততর প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে- একটিতে ২০০২ সাল থেকে, অন্যটিতে ২০০৫ সাল থেকে। কিন্তু এখানেও আসলে কিছু এগুনো-পিছুনোর ব্যাপার রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটিতে ২০০২ সাল থেকে প্রবাহ বৃদ্ধির একটি ফল হয়েছে যে এর অগ্রভাগ দ্রুততর গতিতে সমুদ্রে বরফ নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এর পশ্চাৎভাগ বরফের যোগান সেই গতিতে দিয়ে যেতে পারেনি। ফলে ২০০১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে দেখা গেছে এই হিমবাহ তিন

কিলোমিটার পশ্চাদপসরণ করেছে। এরপর ২০০৫ সালে এসে উৎস থেকে প্রবাহ জোরদার হলে আবার এটি আরো দ্রুততর প্রবাহে সমুদ্রে বরফ নিয়ে চলেছে। প্রশ্ন হলো এই প্রবণতাগুলো কি সাময়িক, না ভবিষ্যতে এগুলো আরো জোরদার হবে। এসবই এখন সবাইকে ভাবনায় রেখেছে।

চৌত্রিশ দিনে ভাঙ্গলো লারসেন-বি

হিমবাহের অগ্রভাগ যদি সমুদ্র তটে গিয়ে পানিতে ভাসমান হয় তা হলে সেই ভাসমান অংশকে বলা হয় আইস-শেলফ। বড় বড় হিমবাহগুলোতে এই আইস-শেল্‌ফ হয় বিশালকায়– পানির উপর জগদ্দল বরফের মত শক্ত

ও স্থায়ী হয়ে এটি পেছনের হিমবাহের প্রবাহকে এক রকম ঠেকনার মত বাধা দিয়ে রাখে– যার ফলে পানিতে এর বরফ সহজে বিলীন হতে পারেনা। যতদিন পর্যন্ত আইস-শেল্‌ফ অক্ষত থাকে হিমবাহও অটুট থাকে। কিন্তু এটি ভাঙ্গতে আরম্ভ করলে হিমবাহও দ্রুত বেগে পানিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। গ্রীনল্যান্ডে এবং আন্টার্কটিকায় এরকম অনেকগুলো বিশাল বিশাল আইস-শেল্‌ফ রয়েছে এখানকার হিমবাহগুলোর সামনে। এমনি একটি বিশাল আইস-শেল্‌ফ হলো পশ্চিম আন্টার্কটিকার লারসেন-বি। এর আয়তন ৩,২৫০ বর্গ কিলোমিটার। ভাসমান এই বরফের পুরুত্ব ২২০ মিটার। নানা সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় অন্তত গত ১২০০০ বছর ধরে

লারসেন-বি অক্ষত ছিল তার বিশাল বরফের ভান্ডার নিয়ে। কিন্তু ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চের মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে এটি খন্ড খন্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। লারসেন-বি এর পেছনে রয়েছে চারটি বড় বড় হিমবাহ। তাদের অগ্রভাগে এই আইস-শেল্‌ফ ভেঙ্গে পড়ায় তাদের বরফের প্রবাহ বেড়ে

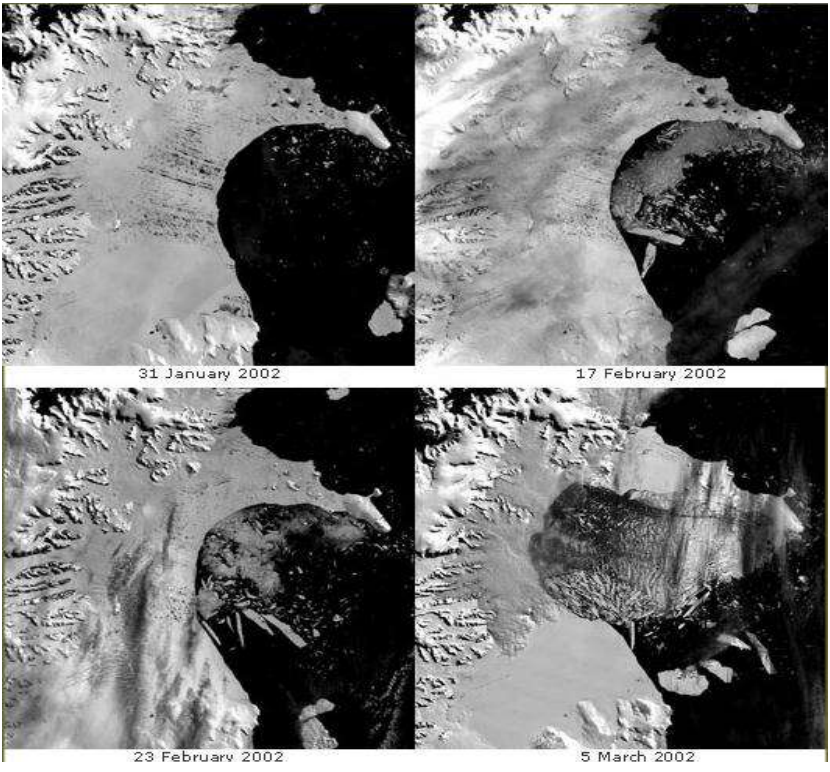

৩৫ দিনে লারসেন-বি
সম্পূর্ণ বিযুক্তি ও বিলুপ্তি (উপগ্রহ ছবি)

সেগুলো পানিতে ঝাঁপ দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০০৩ সালের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে তখন ২০০০ সালের চেয়ে ৬ গুণ বেশি হারে হিমবাহগুলো পানিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

২০০২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী নাসার মোডিস উপগ্রহ থেকে প্রথম লারসেন-বিতে ফাটল দেখা দিয়ে ভাঙ্গার প্রক্রিয়া শুরুর চিত্র ধরা পড়ে।

কাছাকাছি জায়গায় ছিল বৃটিশ আন্টার্কটিকা সার্ভের একটি জাহাজ। একে লারসেন-বি এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয় ভাল করে ব্যাপারটি দেখার জন্য। বেশ কিছু বিমানও আকাশ থেকে এর উপর নজর রাখে। সব উৎস থেকে পরের দিনগুলোতে খবর আসে যে লারসেন-বি দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে আর এর পেছনের হিমবাহগুলো দ্রুত পানিতে এগুচ্ছে। ৩১ জানুয়ারী প্রথম লক্ষ্য করা হয়েছিল যে অল্প কিছু ভাঙ্গা টুকরা এই আইস-শেলফ থেকে ভেঙ্গে পানিতে যাচ্ছে। পরপর দিনগুলোতে দেখা গেল ক্রমেই তলা থেকে বড় বড় ও বেশি বেশি টুকরা খসে পড়ে শেলফটি আরো পাতলা ও আরো ভঙ্গুর হচ্ছে। ৫ই মার্চের ছবিতে দেখা যাচ্ছে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়া শেল্‌ফের ছোট-বড় টুকরায় পুরো এলাকার পানি ভর্তি হয়ে আছে। এভাবে যেই শেল্‌ফ তার পেছনের চারটি বিশাল বরফনদী রূপী হিমবাহকে আটকে রেখেছিল তার বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়াতে ওগুলোর বরফ এগিয়ে এসে সমুদ্রে যাওয়াতে আর দেরী হয়নি।

লারসেন-বি এর দ্রুত ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা নাটকীয়ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে জমাট বরফ গলার হারটি এখন ক্রমেই দ্রুততর হচ্ছে এবং সামনে হয়তো আরো আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়তেই থাকবে। এর কারণ আন্টার্কটিকায় ও গ্রীনল্যান্ডে এরকম আইস-শেল্‌ফ ভঙ্গুরতা আরো নানা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এই ভঙ্গুরতার প্রকৃত প্রক্রিয়াটি নিয়েও অনেক চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন আইস-শেল্‌ফের উপর বরফগলা পানির হ্রদগুলোই এর কারণ। আগের গ্রীষ্মে উপরের গলে যাওয়া বরফ এই অগভীর হ্রদের সৃষ্টি করে। স্পষ্টত: ২০০২ এর দিকে এসে এরকম বরফের উপর বরফ-গলা হ্রদের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের বরফের মধ্যে নানা ফাঁক ফোকর ও ফাটল দিয়ে এই হ্রদের পানি আইস-শেলফের তলায় এবং তারপর সমুদ্রে চলে যায়। প্রবল তোড়ের রূপ লাভ করে কয়েক দিনের মধ্যে এই বিশাল পরিমাণ পানি নিচে চলে যেতে দেখা গেছে। ফাটলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত এই তোড় ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করেছে বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় টুকরাগুলো সরে যেতে এই পানি এক ধরনের পিচ্ছিলকারক হিসাবেও কাজ করেছে।

সঙ্গত কারণেই বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের চালচিত্র বুঝতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সব জমাট বরফ হিমবাহ ও আইস-শেল্‌ফের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। উপগ্রহের নজরদারিও আরো সূক্ষ্ম করা হয়েছে। উপগ্রহ থেকে মাধ্যাকর্ষণের ম্যাপিং করার জন্য গ্রেইস পদ্ধতি আরো কার্যকর হয়েছে। কিন্তু একই সময় এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন আর্কটিক অঞ্চলে ভূ-তাত্ত্বিক কারণে পূর্ববর্তীকালে নিচের দিকে দেবে যাওয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এখন প্রতি বছর প্রায় ৯ মিলিমিটারের মত হারে উপরের দিকে ফুলে উঠছে। এর সৃষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে মাধ্যাকর্ষণের বাড়া কমার সঙ্গে বরফ গলার সম্পর্কের ব্যাপারটিতে কিছুটা সংশোধন করে নেবার প্রয়োজন হয়। এজন্য শুধু উপগ্রহের উপর নির্ভর করলে চলছেনা। বরফের মধ্যেই প্রোথিত করে দিতে হচ্ছে এমন যন্ত্র যা বরফের গতি প্রকৃতি অনুসরণ করতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠের ফুলে উঠার প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করতে সম্প্রতি গ্রীনল্যান্ডে স্থাপন করা হয়েছে ২৪টি জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ষ্টেশন। জিপিএস এর সাহায্যে বরফের নানা অংশের অবস্থান কয়েক মিটারের মধ্যে নির্ণয় করা যায়– প্রতি মুহূর্তে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতার সঠিক নির্ণয়নের মাধ্যমে। ২৪টি ষ্টেশনের এই ব্যবস্থাকে বলা হয় গ্রীনল্যান্ড জিপিএস নেটওয়ার্ক- সংক্ষেপে 'জিনেট'। কিন্তু দুর্গম অত্যন্ত শীতল নানা অঞ্চলে ব্যাটারি দিয়ে ষ্টেশনগুলো চালানো বেশ ব্যয়বহুল। অথচ এদিকে জিপিএস যন্ত্রগুলো অনেক সস্তা হয়ে গেছে - অনেকটা মোবাইল ফোনের আকার-আকৃতি ও ব্যয়ের পর্যায়ে। তাই আরো অভিনব সাম্প্রতিক পদ্ধতি হলো আইস-শেলফগুলোর কিনারায় মোবাইল ফোনের মত দেখতে সস্তা জিপিএস যন্ত্রগুলোই নানা জায়গায় প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমুদ্রে গিয়ে পানির তোড়ে হারিয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ এগুলো বরফের গতিবিধি সম্পর্কে রেকর্ড পাঠাতে পারছে।

চক্রবৃদ্ধির পাগলা ঘোড়া

চক্রবৃদ্ধি কী

আমরা গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার সরল হিসাবে দেখেছি বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্বিগুণ হলে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়ার কথা ১.২°সে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি স্মরণ রেখে হিসাব করলে এই উত্তাপ বাড়বে ২.৫°সে। দুই হিসাবে এই বিরাট পার্থক্যের কারণ চক্রবৃদ্ধি। এটি শুধু হিসাবকে জটিলতরই করছেনা, একে অনেকাংশে অনিশ্চিতও করে তুলছে। ব্যাপারটি হচ্ছে উত্তাপ বৃদ্ধির ঘটনাটি সরল রেখায় এগুচ্ছেনা। এমন সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া রয়েছে যার ফলে উত্তাপ একটু বাড়লে সেই বাড়াটাই আবার প্রক্রিয়াটিকে উস্‌কে দিয়ে আরো বড় আকারে উত্তাপ বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। কারণ ও ফলাফলের সম্পর্কের মধ্যে প্রথমবার উত্তাপ বাড়াটি ছিল একটি ফলাফল বা আউটপুট। এই আউটপুটটিই আবার পরবর্তী অধিকতর উত্তাপ বাড়ার জন্য একটি নূতন কারণ বা ইনপুট হয়ে দাঁড়ায়। এতে যেন আউটপুটটিকেই চক্রাকারে ঘুরিয়ে এনে আবার বাড়তি ইনপুটে পরিণত করা হয়েছে। এভাবে নিয়ে আসাটিকে বলা হয় ফীডব্যাক। বাড়তি ইনপুট তখন আরো বাড়তি ফলাফলের সৃষ্টি করবে এবং এভাবে বারবার চক্রাকারে বাড়তেই থাকবে। তাই আমরা একে বলছি চক্রবৃদ্ধি। ফীডব্যাকের আসল প্রকৃতিগুলো দেখলে এটি ভাল বুঝা যাবে।

বরফ গলাটিই হয়ে পড়ে বাড়তি কারণ

আমরা দেখেছি কীভাবে মেরু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গায় এবং অনেক উচ্চভূমিতে বরফের চাদর এখন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধির একটি সরাসরি ফল হিসাবে সাম্প্রতিক সময়ে এসে হাজার বছরে জমা এই বরফের পুঁজিতে দ্রুত টান পড়ছে। বরফ চাদরে এই আচ্ছাদনের একটি বড় ভূমিকা হলো সূর্যকিরণকে আয়নার মত প্রতিফলিত করে উপরের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া। যত সৌর কিরণ ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ে এই প্রতিফলনের কারণে তার সবটুকু এখানে শোষিত হতে পারেনা। এভাবে এই বরফ আচছাদন ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বেশ কিছু কমিয়ে রাখে। এই আচ্ছাদ্দন কমলে

এই উত্তাপ কমিয়ে রাখার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সাম্প্রতিক বরফ হারানোর ফলে প্রতিফলন কমে গিয়ে উত্তাপ আরো বেড়ে যাচ্ছে। এটি সেই ফীডব্যাকগুলোর একটি। এতে পর্যায়ক্রমে যা ঘটছে তা এরকম: গ্রীন হাউস গ্যাসের কারণে উত্তাপ বাড়ছে। তার ফলে বরফ আচ্ছাদন কমছে। তার ফলে সৌরকিরণের প্রতিফলন কমে গিয়ে উত্তাপ আরো বাড়ছে। সেটি আবার আরো বরফ গলাচ্ছে। এভাবে প্রক্রিয়াটি তীব্রতর হচ্ছে- আর প্রত্যেক চক্রেই আগেরটির চেয়ে অধিকতর উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। চক্রবৃদ্ধির এই পাগলা ঘোড়া উত্তাপকে ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যাবে তার হিসাব

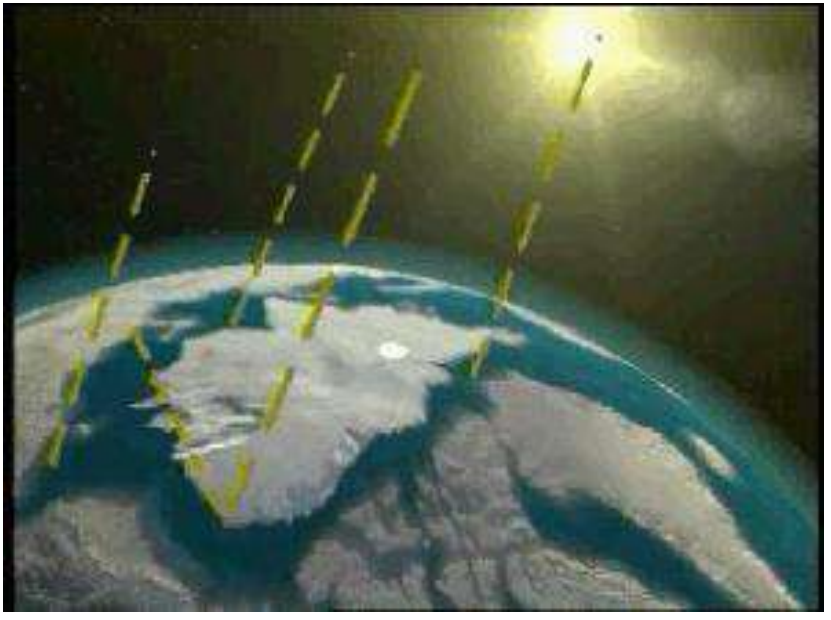

বরফ গলার ফলশ্রুতিতে সূর্য-কিরণের প্রতিফলন কমছে, শোষণ বাড়ছে

পাওয়া আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ছে। এর সমাধান একটিই– এই পাগলা ঘোড়াকে চলা শুরু করতেই না দেয়া– অর্থাৎ গ্রীন হাউস গ্যাস বাতাসে যেতে না দেয়া।

অন্য কিছু ফীডব্যাক

কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে যাওয়াটাকে কিছুটা কমিয়ে রাখে এই গ্যাস সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত হওয়াটি। কিন্তু কী পরিমাণ দ্রবীভূত হবে তা নির্ভর করে পানির উষ্ণতার উপর। পানির উষ্ণতা বেশি হলে তার গ্যাস দ্রবীভূত করার ক্ষমতা কমে যায়। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধির একটি ফলশ্রুতি হলো সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরে যাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়া। এর অর্থ বায়ুমন্ডলে সেটি বেশি যাওয়া, ফলে উত্তাপ আরো বাড়া, সমুদ্রের পানি আরো উষ্ণ হওয়া, তার দ্রবণ ক্ষমতা আরো কমা, এবং প্রকারান্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আরো বেশি বাতাসে গিয়ে উত্তাপ আরো বাড়া। এমনিভাবে ভিন্ন কারণের আর একটি চক্রবৃদ্ধি চলতে থাকা।

চক্রবৃদ্ধির আরো একটি উৎস হলো মাটি। মাটিতে সব সময় গিজগিজ করছে বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র প্রাণি, বিশেষ করে নানা ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের জৈব প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু গ্রীন হাউস গ্যাস বাতাসে উদ্গীরণ করে- প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন। ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়লে ব্যাকটেরিয়ার এসব জৈব প্রক্রিয়ার হারও বেড়ে যায় এবং ফলে তাদের গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণও বাড়ে। ফলে ভিন্ন আর একটি চক্রবৃদ্ধির সুযোগ এখানে ঘটে।

মাটি ভিত্তিক এই চক্রবৃদ্ধিটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এর সঙ্গে বরফের একটি সম্পর্কের কারণে। ভূ-পৃষ্ঠের উপর কিংবা সমুদ্রের উপর বরফ জমে থাকার ব্যাপারটি আমরা দেখেছি। কিন্তু পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাটির ভেতরেও বরফ জমে থাকে এবং উপরে মাটির আবরণের তলে তা স্থায়ী ভাবেই থাকে, গ্রীষ্মে গলে যায় না। এই বরফকে বলা হয় পার্মাফ্রস্ট। ঠান্ডার কারণে কোন বস্তুর সঙ্গে গায়ে গায়ে মাখানো পানি জমাট বেঁধে সৃষ্টি হওয়া বরফকে ফ্রস্ট বলা হয়। দেখা গেছে যে কোন জায়গার মাটি বা শিলা যদি একটানা দু বছরের বেশি ধরে ০°সে বা তারো নিচে ঠান্ডায় থাকে তা হলে সেখানে জমা ফ্রস্ট স্থায়ী রূপ নেয় এবং পার্মাফ্রস্টে পরিণত হয়। সাইবেরিয়া, কানাডা, আলাস্কা, চীন, মঙ্গোলিয়া, আল্পীয় উচ্চ ভূমিসহ পৃথিবীর

উষ্ণতা পার্মাফ্রস্টকে বরফমুক্ত করছে
এর থেকে বাড়ছে সমুদ্রের পানি, বাড়ছে গ্রীণহাউস গ্যাস উদ্গীরণ

স্থলভাগের প্রায় এক পঞ্চমাংশ অঞ্চল একরকম স্থায়ী ভাবেই পার্মাফ্রস্ট হয়ে রয়েছে। এভাবে বরফ-শীতল হয়ে থাকা মাটির সঙ্গে মিশে আছে প্রচুর পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি পার্মাফ্রস্ট থাকছে ততদিন এই গ্রীন হাউস গ্যাস এখানেই আটকে থাকছে। কিন্তু সমস্যা হলো ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে এখন পার্মাফ্রস্ট নানা জায়গায় গলতে আরম্ভ করছে, এগুলো আর বরফ-শীতল থাকছেনা। পার্মাফ্রস্ট গলে ওখানকার ভূমির উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে আটকে থাকা গ্রীন হাউস গ্যাস আর আটকে থাকতে পারছেনা, বাতাসে চলে যাচ্ছে। বরফ-শীতল অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকা মাটির ব্যাকটেরিয়াগুলোও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। এটি ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ আরো বাড়িয়ে আরো পার্মাফ্রস্ট গলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কাজেই এখানেও রয়েছে আর একটি চক্রবৃদ্ধি। এসব চক্রবৃদ্ধিগুলো বিশ্ব-জলবায়ু পরিবর্তনকে পাগলা ঘোড়ার আকার দিয়ে খুবই জটিল ও অস্থিতিশীল করে তুলছে। আমাদের আশঙ্কার বড় হেতু এখানেই।

উল্টো দিকেও ফীডব্যাক আছে

জটিলতা ও অনিশ্চয়তা আরো বেড়েছে তার কারণ ঋণাত্মক ফীডব্যাক হবার মত কিছু কিছু প্রক্রিয়াও রয়ে গেছে। এগুলো বরং উত্তাপের হ্রাসের কারণ ঘটায়। যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়লে এর কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করার ক্ষমতা কমে গিয়ে উত্তাপে চক্রবৃদ্ধি যেমন ঘটে, তেমনি আবার সমুদ্রের ক্ষুদ্র প্ল্যাংকটন, শৈবাল ইত্যাদি উদ্ভিদের সমারোহে বৃদ্ধি ঘটে। এরা সালোক সংশ্লেষনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। আবার এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে এসব উদ্ভিদের আচ্ছাদন বেড়ে গিয়ে নিচের পানিকে সূর্য কিরণে তত বেশি উত্তপ্ত হতে দেয়না। কাজেই উত্তপ্ত হতে পারলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করার ক্ষমতা যেভাবে কমতো সেরকম এখানে কমেনা। কাজেই সব মিলে চক্রবৃদ্ধি এক্ষেত্রে যেমন ভাবে হবার কথা ছিল তেমন হতে পারে না। এই উল্টো প্রক্রিয়া হিসাবের জটিলতা ও অনিশ্চয়তা আরো বাড়িয়ে দেয়।

আর একটি ফীডব্যাক আবার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুদিকেই কাজ করে– সেটি হলো অধিক উত্তাপে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অধিকতর বাষ্পীভবনের ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্প ও মেঘ বেড়ে যাওয়া। যেহেতু জলীয় বাষ্প ও মেঘ গ্রীন হাউস প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড অনুরূপ ভূমিকা রাখে তাই এটিও উত্তাপের চক্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করে থাকে। অধিক উত্তাপে অধিক বাষ্পীভবন ও মেঘ, এর ফলে আরো গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় আরো উত্তাপ বৃদ্ধি, তার ফলে আরো বেশি বাষ্পীভবন এভাবে চক্রবৃদ্ধিতে উত্তাপ বাড়বে। কিন্তু ঐ জলীয় বাষ্প ও মেঘের অন্য একটি ভূমিকা রয়েছে যা সম্পূর্ণ বিপরীত ফলশ্রুতি দেয়। মেঘ ও বাষ্পের আবরণ বাড়লে সৌরকিরণ বাধা পেয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ কমেও যায়। অধিক বাষ্পীভবনে এভাবে উত্তাপ বাড়া ও কমার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটি বেশি মুখ্য তা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে না। কয়েক রকম ঋণাত্মক ফীডব্যাক উত্তাপ বাড়ার রাশ কিছু কিছু টেনে ধরলেও এতে চক্রবৃদ্ধির আসল পাগলা ঘোড়ার দাপট তেমন করে কমছে বলে মনে করেননা বিজ্ঞানীরা। অন্য দিকে এসব ঋণাত্মক ফীডব্যাক চক্রবৃদ্ধির হিসাব করাটাকে আরো কঠিন ও আরো অনিশ্চিত করে দিচ্ছে।

মডেলিং ঃ ভবিষ্যদ্বাণীর উপায়

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অতীতে কী ঘটেছে তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আমরা আইসকোরের কল্যাণে মোটামুটি নির্ভুলভাবে বলতে পারছি। সাম্প্রতিক কালের পরিবর্তনগুলো সূক্ষ্ম পরিমাপের কারণে আমাদের কাছে আরো বেশি স্পষ্ট। কিন্তু এগুলোর প্রবণতা থেকে ভবিষ্যতের পরিস্থিতিটি আন্দাজ করা মোটেই সহজ নয়। এর কারণ অনিশ্চিত চক্রবৃদ্ধির ব্যাপারগুলো। এ ধরনের জটিল অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি উপায়ই থাকে, তা হলো কম্পিউটারের সাহায্যে মডেলিং। বিজ্ঞানীরা তাই সেটিই করার চেষ্টা করছেন।

মডেলিং হলো প্রাসঙ্গিক সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গাণিতিক মডেল বা প্রোগ্রাম দাঁড় করানো যাতে করে বর্তমানের উপাত্তগুলো থেকে মডেলের ফরমুলাগুলোর মাধ্যমে ভবিষ্যতের ফলাফলগুলো হিসাব করে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্যই চক্রবৃদ্ধির বিষয়গুলোও এই গাণিতিক ফরমুলার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়, ঋণাত্মক ফীডব্যাকগুলো সহ। বলতে গেলে মডেল হবে বিষয়টির সকল দিক সম্পর্কে আমাদের গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি আকর। একবার মডেলটি খাড়া হয়ে গেলে বাকি কাজটি থাকে নিয়মিত উপাত্ত সংগ্রহের কাজ। যত হাল নাগাদ উপাত্ত, যত বিস্তারিত উপাত্ত কম্পিউটারকে দিতে পারবো কম্পিউটারের ভবিষ্যদ্বাণী তত বেশি নিখুঁত হবে। মডেলিং এর এই পরিচয়টি আরো ভাল বুঝা যাবে যদি আমরা একে আবহাওয়ার পূর্বাভাষের মডেলের সঙ্গে তুলনা করি। যদিও স্থানীয় আবহাওয়া অফিসগুলো বহুকাল ধরেই আবহাওয়ার এক ধরনের পূর্বাভাষ দিয়ে আসছে সে পূর্বাভাষের ফলাফল সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সীমাদ্ধতা ছিল। পূর্বাভাষ দেয়ার পদ্ধতির উন্নয়নের কারণে এখন বিশ্বজোড়া সব জায়গার জন্য অনেক আগেভাগে অনেক বেশি নিশ্চিত করে পূর্বাভাষ দেয়া যাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে মডেলিং। বাতাসের উত্তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, জলীয় বাষ্প, বায়ুপ্রবাহ, মেঘের সৃষ্টি ইত্যাদি সমস্ত প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে এই মডেল। মৌলিক

পদার্থবিজ্ঞান ও আবহ-বিজ্ঞানের সর্বশেষ জ্ঞান ধারন করা হয়েছে এই মডেলের ফরমুলা তৈরির মধ্যে।

এর পরের কাজ এক্ষেত্রেও উপাত্ত সংগ্রহ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য এখন বিশ্বজোড়া উপাত্ত ব্যবহার করা হয় যাতে করে অনেক দূরবর্তী প্রভাবগুলোও এর থেকে বাদ না পড়ে। এর জন্য কার্যত পুরো পৃথিবীর পৃষ্ঠ ও তার উপরে বায়ুমন্ডলকে এক রকম ত্রিমাত্রিক গ্রিডে সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। এটি হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এবং উপর-নিচ এই তিন মাত্রার একটি বিশাল গ্রাফের মত। এখানে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিমের খোপগুলো হলো ১০০ কিলোমিটার পর পর, আর উপর-নিচের খোপগুলো ২ কিলোমিটার পর পর। এভাবে তৈরি খোপগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয় যাতে সেই সবগুলো কম্পিউটারের মডেলে ঢুকানো যায় ঘন ঘন, অতি নিয়মিত ভাবে। উপাত্তগুলো আসে আবহাওয়া কেন্দ্র, আবহাওয়া বেলুন, আবহাওয়া উপগ্রহ ইত্যাদি নানা উৎস থেকে। এর ফলেই পরের দিনের কিংবা পর পর কয়েকদিনের, এমন কি কয়েক সপ্তাহ পরের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলের জন্য নিয়মিত দেয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিভিশনে বিশ্বজোড়া প্রচারিত চ্যানেলগুলো খুললেই আমরা তা নিত্য বর্ণিত হতে দেখি। তাছাড়া ইন্টারনেটে সঠিক ওয়েব সাইটে গেলে বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের বা শহরের ঐ পূর্বাভাষগুলো দেখতে পারি। অবশ্য মোটের উপর সঠিক হলেও, পূর্বাভাষের খুঁটিনাটি সব সময় হুবহু সঠিক হয়না। যত পরের পূর্বাভাষ– ভুল হবার সম্ভাবনাও তত বেড়ে যায়। আবহাওয়া এত বেশি জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, এতো অনিশ্চয়তার শিকার হয় যে, মডেলিংএ এর চেয়ে বেশি শুদ্ধতা আশা করা যায়না।

জলবায়ু পরিবর্তনের মডেলটিও অনেকটা এরকমই। তবে জলবায়ু জিনিসটা আবহাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি দূরপাল্লার। এই মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা দিন বা সপ্তার হিসাবে নয়, বরং বছরের, দশকের, এমনকি শতাব্দীর হিসাবে। মডেলের উপাদানের মধ্যেও আসে ভূমি, সমুদ্র, বায়ুমন্ডল, বরফ, জৈব জগৎ (বায়োস্ফেয়ার) সবকিছু– এবং এদের নানা বিষয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সম্ভাব্য সব রকম ফীডব্যাক এর মধ্যে আনা হয়–

ধনাত্মকগুলোও, ঋণাত্মকগুলোও। সমুদ্রে ও উদ্ভিদে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের যে প্রক্রিয়া রয়েছে এবং অন্য যত ভাবে গ্রীন হাউস গ্যাস বাতাসে যেতে বাধা পায় তাকে হিসাবে ধরা হয়। বাতাসে যাওয়ার পর কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাস কতদিন কার্যকর থাকে, কীভাবে কাজ করে তাও পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটির জন্য ধরা থাকে। দাবানল, ফসিল জ্বালানি ইত্যাদির সৃষ্ট দূষণের ফলে বাতাসে ভস্ম কণিকায় সূর্য কিরণ কী ভাবে বাধা প্রাপ্ত হয় কিংবা জলীয় বাষ্প বা মেঘেও এরকম বাধাপ্রাপ্তি কীভাবে হয় সে প্রক্রিয়াগুলোও খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবে আসে। একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্যটির সময়ের ব্যবধানগুলোও সবক্ষেত্রে বিবেচ্য। এই সবকিছুর উপাত্তগুলোও বিশ্বের সর্বত্র থেকে যথাসম্ভব সংগ্রহ করে মডেলে যথাসম্ভব হালনাগাদ করতে হয়। এখানেও আবহাওয়া কেন্দ্র, বেলুন, উপগ্রহ, বরফের মাপজোক, সমুদ্রজলের মাপজোক ইত্যাদি সব রকম উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির নিত্য উন্নতিও হয়ে চলছে। সব কিছুর উদ্দেশ্য একটিই– অতি জটিল ও অনিশ্চিত একটি বিষয়ে যথাসম্ভব দীর্ঘমেয়াদী নিঁখুত ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া।

আজ যে বিশ্ব জোড়া এতখানি সচেতনতা ও সংকল্প সৃষ্টি হয়েছে–তা এমনি ভবিষ্যদ্বাণীরই ফল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী হচ্ছে

সমুদ্র-উচ্চতা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল বিষয়টি ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ বৃদ্ধি। কিন্তু এর ফলাফল আমাদের কাছে আসে শুধু উত্তাপ বৃদ্ধি হিসাবে নয়, বরং এর কারণে সৃষ্ট অন্যান্য নানা ফলাফলের মাধ্যমে। বাংলাদেশের জন্য এবং এরকম আরো কিছু উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলের জন্য এর সব চেয়ে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হলো সমুদ্র-উচ্চতা বৃদ্ধি। গড় উচ্চতা সামান্য বাড়লেও এ রকম জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যাওয়া, নদ-নদীর মাধ্যমে অভ্যন্তরে লোনা পানি ঢুকে যাওয়া সহ মারাত্মক বিপর্যয় দেখা যাওয়ার কথা, এবং তা ইতোমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে আমাদের দেশে ও আরো কিছু স্থানে। বিশ্ব-উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-পৃষ্ঠ উঁচু হবার কারণ কিন্তু একটি নয়, অন্তত তিনটি। সবচেয়ে বড় ভূমিকা যার সেটি হলো উত্তাপের ফলে পানির সম্প্রসারণ। কঠিন, তরল, বায়বীয় যে রকমই হোকনা কেন উত্তাপের ফলে পদার্থ আয়তনে সম্প্রসারিত হয়– এটি সেই সম্প্রসারণ। সমুদ্র-উচ্চতা বাড়ার জন্য ৬০% দায়িত্ব এই কারণের। আর একটি কারণ হলো আর্কটিকে ও আন্টার্কটিকায় জমাট বরফ গলার ফলে যে বাড়তি পানি সমুদ্রে এসে যোগ দিচ্ছে তা। উচ্চতা বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা ২৫%। বাকি ১৫% এর জন্য দায়ী হলো পার্মাফ্রস্টের গলার ফলে সৃষ্ট বাড়তি পানি। ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ পার্মাফ্রস্টের উপরিভাগকে বরফশীতল অবস্থা থেকে উষ্ণতর অবস্থায় আনে

এবং এর উপরের বেশ খানিকটা পুরু অংশ থেকে পানি বেরিয়ে আসে ও সেখানে জলাভূমির অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই পানি নানা প্রবাহের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত সমুদ্র পানিতে এসে যুক্ত হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে বহুবার সমুদ্র-পৃষ্ঠের সাংঘাতিক উঠানামা ঘটেছে বড় ধরনের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে। এর ফলশ্রুতিতে জীব জগতেও দেখা দিয়েছে অনেক বড় বড় পরিবর্তন, অনেক ব্যাপক বিপর্যয় ও বিলুপ্তি। সর্বশেষ বরফ যুগের শীতলতম সময়ে ১৮ হাজার বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ এখনকার থেকে ১৩০ মিটার নিচে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এখন সমুদ্রের মধ্যে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো তখন স্থল ভাগ ছিল– অনেক দ্বীপাঞ্চল তখন সরু স্থল ভাগ দিয়ে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ১৮ হাজার বছরে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পৃষ্ঠ ১৩০ মিটার উপরে উঠে এসেছে। কাজেই ব্যাপারটি মোটেই অভাবনীয় নয় আর এর মারাত্মক পরিণতিগুলোও নূতন কিছু নয়। কিন্তু মানুষের নিজের দোষে এমন কিছু ঘটা এবং তা মানুষের জন্যই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়ার ব্যাপারটিই হবে এক্ষেত্রে নতুন।

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে অতি সাম্প্রতিক এই সমুদ্র-উচ্চতা বৃদ্ধি ঠিক কতখানি হচ্ছে এর পরিমাপটি অবশ্য সমস্যা সঙ্কুল। এমনিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের

সমুদ্রে আংশিক নিমজ্জিত টাইড গেজ

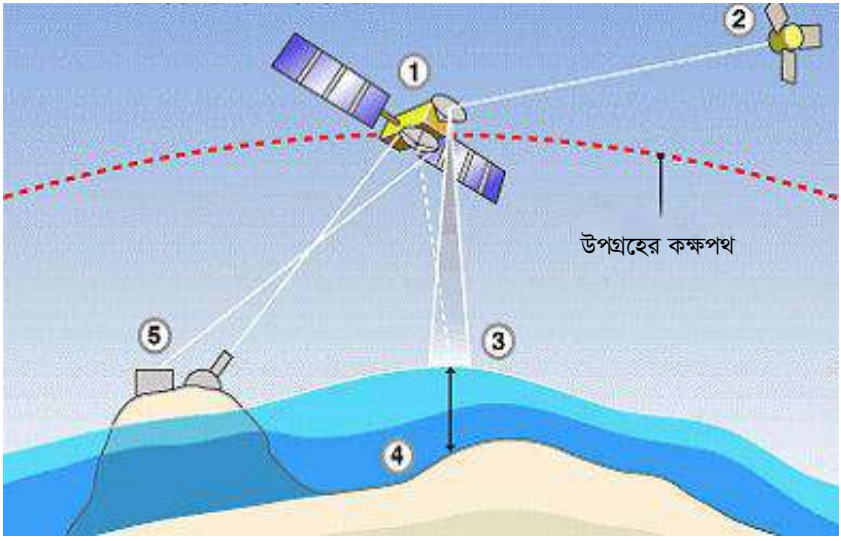

উপগ্রহের সহায়তায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা নির্ণয়

উচ্চতা নির্ণয়ের কাজটি বহু দিন থেকে নিয়মিত করা হচ্ছে প্রধানত সমুদ্রের স্থানবিশেষে জোয়ার ভাটার উঠানামা ইত্যাদি মাপার জন্য। এটি করতে টাইড গেজ বা জোয়ার মাপক নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এজন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় টাইড গেজ ষ্টেশন থাকে নিয়মিত জোয়ার ভাটায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা রেকর্ড করতে। সমুদ্রে ঢেউয়ের উতাল পাতালের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে আসল উচ্চতা মাপতে পারার জন্য এতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে টাইড গেজে ৩০ সেন্টিমিটার ব্যাসের এক রকম সিলিন্ডার পানিতে ডুবিয়ে ব্যবহার করা হয় যাতে পানি-তলের নিচে ছিদ্র থাকে। সিলিন্ডারের মধ্যে ঢেউয়ের প্রভাব থাকেনা বলে নিরুপদ্রবে উচ্চতাটি মাপা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে প্রাসঙ্গিক যে গড়পড়তা সমুদ্র-উচ্চতা তা সহজে মাপা সম্ভব। প্রথমত বরফ গলা পানি দ্রুত সর্বত্র বিস্তৃত হয় না। কাজেই এর প্রতিক্রিয়া সব সমুদ্রে দেখা দিতে সময় লাগে। তাছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা শুধু পানির প্রসারণের বা বাড়ার ফলে বাড়েনা, সমুদ্রতল উপরের দিকে জেগে উঠলেও তা বাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীনল্যান্ড বা সুইডেন-নরওয়ের কাছে বহুকাল ধরে সমুদ্রতল একটু একটু করে জেগে উঠছে, আবার এর দক্ষিণের অঞ্চলে এটি দেবেও যাচ্ছে।

এগুলোকে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে আসল পরিমাপ পাওয়া যাবেনা। তাছাড়া মাপার সময় জোয়ার-ভাটার কারণে উচ্চতায় বৈচিত্র ঘটছে, স্থানীয় মৌসুমী উত্তাপের কারণে প্রসারণের ফলেও এতে বৈচিত্র ঘটছে। যে পানি নদী সমুদ্রে এনে ফেলছে, বা বৃষ্টিপাতের ফলে যে নূতন পানি আসছে, তার কারণেও ওখানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হতে

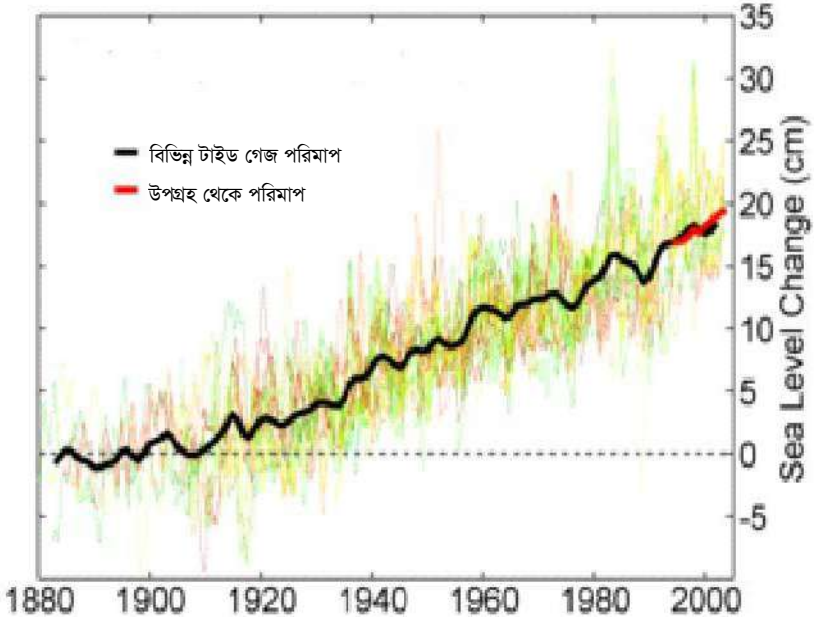

গত একশ' বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিঃ ২০ সেঃমিঃ

পারে। এসবের মধ্য থেকে আসল গড় উচ্চতাটি বের করে আনতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে উপগ্রহ থেকে সমুদ্রউচ্চতা মাপার আরো নিখুঁত ব্যবস্থা হয়েছে। এর থেকে বিভিন্ন জায়গার উপর দিয়ে পরিক্রমণের সময় ঐ জায়গায় একই সঙ্গে সমুদ্রতলের অবস্থান ও সমুদ্রপৃষ্ঠের অবস্থান উভয়টি নির্ণয় করে পানির প্রকৃত উচ্চতা বৃদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

গত ১০০ বছরে পৃথিবীর নানা জায়গার টাইড গেজ ষ্টেশনগুলো থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায় যে এ সময়ের মধ্যে গড়ে সমুদ্র উচ্চতা বেড়েছে

প্রায় ২০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ এ সময়ে বছরে গড়ে বেড়েছে ২ মিলিমিটার। ১৯৯২ সন থেকে নেয়া উপগ্রহ পরিমাপে এ পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২.৮ মিমি বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। তবে একেবারে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসে সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধির হার বেড়ে গেছে। টাইড গেজের পরিমাপে এটি এখন বছরে ৪ মিমি এ দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এর থেকে বেশি বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন বাংলাদেশে খুলনা অঞ্চলে বছরে ৫.১৮ মিমি সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ উচ্চতা কী হারে বাড়ে এখন সেটিই তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি বাংলাদেশের মত দেশে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ে আসছে। উপকূল ডুবার বিষয়টি তো আসে সবার আগে– যে জায়গা পানির বাইরে ছিল পরে তা পানির ভেতরে চলে যাচ্ছে। এর ফলে বেশ কিছু বাড়তি প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে– দেশের ভেতর লবণাক্ততা ঢুকে যাচ্ছে, সুপেয় পানির অভাব ঘটছে। তাছাড়া জোয়ারের উচ্চতা বেড়ে নদীর স্বাভাবিক স্রোত কমে যাচ্ছে, এতে নদীতে পলি জমাও বেড়ে যাচ্ছে যা স্রোতকে আরো ধীর এবং বন্যাকে ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে নদীর গতির মসৃণতা কমিয়ে এতে ঘুর্ণি বাড়াচ্ছে যা নদী ভাঙ্গনে অবদান রাখে। বাংলাদেশের মত নদীমাতৃক দেশে এসব প্রতিক্রিয়া অল্পতেই অনেক বেশি অঘটন ঘটাবার ক্ষমতা রাখে– তাই উদ্বেগটি নানামুখি।

সাইক্লোনের প্রকোপ বৃদ্ধি

গভীর সমুদ্রে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় শক্তিশালী ও গতিশীল হয়ে উপকূলে আঘাত হানলে কী ঘটতে পারে তা আমাদের চেয়ে ভাল করে বোধ হয় আর কেউ বুঝবেনা। এই ঘূর্ণিঝড় জিনিসটি আবহাওয়ার একটি খুব অনিশ্চিত জিনিস, সৃষ্টি হবার ব্যাপারে এর যেমন কোন পূর্বাভাস সম্ভব হয়না, সৃষ্টি হবার পরও তার গতিবিধি বুঝা খুবই দুরূহ। তারপরও আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষেত্রে কার্যকর জ্ঞানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে অধিকতর কাজ হয়েছে মেক্সিকো উপসাগরে সৃষ্ট 'হারিকেন' নামে পরিচিত ঘূর্ণিঝড় সমূহ নিয়ে যেগুলো প্রায়শ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ক্যারিবিয় অঞ্চলে আঘাত হেনে থাকে। গত বহু দশক থেকে লক্ষ্য করা হয়েছে যে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও

তীব্রতায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নির্দিষ্ট বছর পর পর চক্রে। এতে ১৯৪০, ১৯৬০ আর ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এক একবার শীর্ষে উঠতে দেখা গেছে, তারপর আবার কমেও গেছে। কিন্তু আরো সাম্প্রতিক কালে যা দেখা যাচ্ছে তা হলো এক ধরনের একটানা বৃদ্ধি, চক্রাকারে হ্রাসবৃদ্ধি নয়। সব ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যায় ততটা নয়, বরং সর্বাধিক তীব্রতার ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। অনেকেই মনে করছেন এই বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে।

সমুদ্র বক্ষে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টির পেছনে বড় কারণ হলো সেখানকার উষ্ণতর পানি। এরকম পানি থেকে বাষ্পীভবন বেশি হয়, প্রসারণ বেশি হয়। এগুলো ওখানটায় বজ্র-বিদ্যুৎ ও ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এক ধরনের ট্রিগারের কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় বাড়তি বাষ্প যখন ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হয় তখন সুপ্ত তাপ বের হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য শক্তি যোগায়। তাই ভূপৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড় বিশেষ করে তীব্র আকারের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে বৈকি।

তীব্রতার বৃদ্ধি অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়কে ক্যাটাগরি-১ থেকে ক্যাটেগরি-৫ পর্যন্ত কতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হয়। ১৯৭০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত

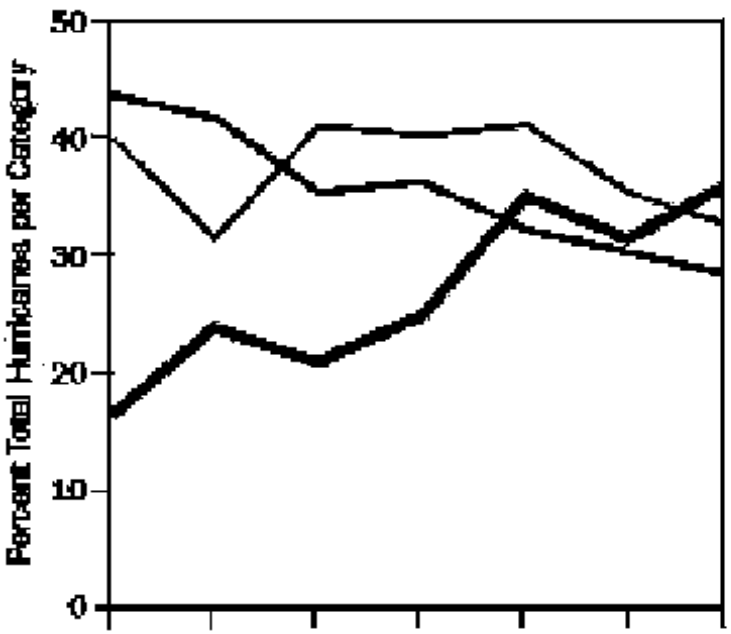

তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের (ক্যাটাগরি ৪ ও ৫) সংখ্যা বৃদ্ধি কম তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা হ্রাস (১৯৭০-২০০৪)

সময়ের জরিপে দেখা যাচ্ছে যে এ সময় সব ঘূর্ণিঝড়ের ভেতরে তীব্রতর শ্রেণীগুলো– ক্যাটাগরি ৪ এবং ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড়গুলোই শতাংশের হিসাবে অনেক বেড়ে গিয়েছে। ১৯৭০ এ যেখানে এরা ছিল সব ঘূর্ণিঝড়ের ১৬/১৭ শতাংশ, ২০০৪ এ এসে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতর হবার প্রবণতা ক্রমে বাড়ছে। হয়তো বা সত্তরের বা নব্বই এর প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়গুলো যেখানে কয়েক দশক পর পর এসেছে, সেখানে ২০০৭ এর সিডরের মত বা তারো চেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আমরা ঘনঘনই পেতে থাকবো। বাংলাদেশের মত ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস প্রবণ এলাকার জন্য এটি মারাত্মক সংকেত। প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতে এই প্রবণতাটি কতখানি বাড়বে সেটি, আর কবে এটি আমাদের সহ্য ক্ষমতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

চরম আবহাওয়া সৃষ্টি

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে এটি প্রায় সব জায়গাতেই সর্বোচ্চ উত্তাপকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। এটি শীতের তীব্রতাকে কমায়– বিশেষ করে মাঝে মাঝে তীব্র শীতের যে শৈত্যপ্রবাহ সৃষ্টি হয় সেগুলো কমায়। অন্যদিকে ইউরোপে যে সব জায়গায় গ্রীষ্মের প্রকোপ আগে মোটেই ছিলনা সেখানেও এখন অসহ্য দাবদাহ দেখা যাচ্ছে, গরমে মানুষ মারাও যাচ্ছে কখনো কখনো। অধিক উত্তাপ উষ্ণতর অঞ্চলে আরো নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে।

অধিকতর উত্তাপ সমুদ্র ও অন্যান্য জলরাশি থেকে অধিকতর বাষ্পীভবন সৃষ্টি করছে। এর ফলে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ইত্যাদি বাড়ছে। কিন্তু মুশকিল হলো যেখান থেকে বাষ্পীভবন হয় বৃষ্টিপাত সেখানেই হয়না। অনাবৃষ্টির জায়গায় যদি এই বাড়তি বৃষ্টিপাতটুকু হতো তা হলে কিন্তু ভালই হতো। কিন্তু আবহাওয়ার যে গতিপ্রকৃতি বাংলাদেশ ও তার কাছাকাছি কিছু জায়গায় প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায় সেগুলোই এই বাড়তি বৃষ্টিকেও সেসব জায়গাতেই নিয়ে যায়। ফলে অতিবৃষ্টি বাংলাদেশে যখন বন্যার প্রকোপ বাড়ায় আফ্রিকার সাহেলে খরা তখন চলতেই থাকে। বরং এটি খরাপীড়িত অঞ্চলে খরা বাড়াতেও পারে– দ্রুত বাষ্পীভবনের একটি ফলশ্রুতি হিসাবে।

এভাবে সাম্প্রতিককালে অনেক স্থানে অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ছে এবং অন্যত্র খরার প্রকোপও বাড়ছে। এগুলোর জন্য অনেকাংশেই জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হচ্ছে, যদিও সম্পর্কটি খুব সরাসরিভাবে প্রমাণ করা দুরূহ।

উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে শৈত্য বৃদ্ধি

ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি আবার প্রকারান্তে কিছু শীত প্রধান দেশের শৈত্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। সমুদ্র স্রোতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত যে প্রক্রিয়াটি এসব দেশের শৈত্য কমিয়ে রেখেছিল তাতে সমস্যা দেখা দেয়ার মাধ্যমেই এই হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। উপসাগরীয় স্রোত নামে পরিচিত উষ্ণ স্রোতটি মধ্য আটলান্টিক থেকে উষ্ণতর পানিকে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে যায়, যার ফলে সেখানে বৃটেন, নরওয়ে ইত্যাদি দেশে শীত অনেক মৃদু থাকে। এর অভাবে উচ্চ অক্ষাংশের কারণে কানাডার শীত যেমন তীব্র একই অক্ষাংশে থাকা এসব দেশেও অনুরূপ শীত থাকতো। এই উষ্ণ স্রোতটি কাজ করে কিছু চমৎকার প্রক্রিয়ায়। এটি অংশত কাজ করে নিজের অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তনের ফলে, আর অংশত: উত্তাপ ও লবণাক্ততার পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট সমুদ্রজলের একটি চক্রাকার আসা-যাওয়ার ফলে। এই শেষোক্ত জিনিসটিকে একটি কনভেয়ার বেল্টের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষ বা মালপত্রকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত কনভেয়ার বেল্ট সাধারণত উপর দিয়ে কোন স্থানে গিয়ে আবার নিচ দিয়ে ফেরৎ আসে এবং চক্রাকারে চলতে থাকে। উপসাগরীয় স্রোতে সমুদ্রের পানিতেও এমনটি ঘটছে।

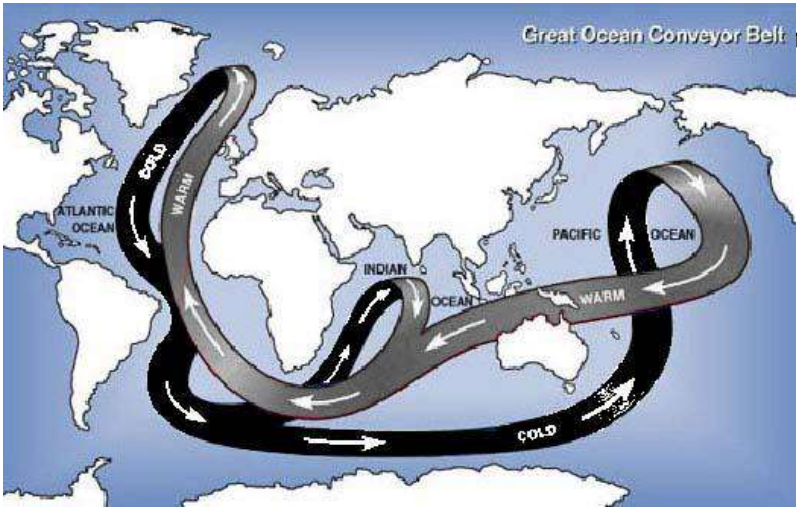

উষ্ণতা ও লবণাক্ততা নির্ভর
মহা-সামুদ্রিক কনভেয়ার বেল্ট

মধ্য আটলান্টিকের উষ্ণ এলাকায় সমুদ্রের পানি উষ্ণ ও হালকা, তাই তা সমুদ্রের উপরের দিকে উঠে আসে এবং উত্তর মেরুর শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। যাওয়ার পথে উষ্ণতর পানির অধিক বাষ্পীভবন তাকে অধিক লবণাক্ত করে তোলে। মেরু অঞ্চলে যখন পৌঁছে এ পানি তখন যথেষ্ট শীতল ও অধিক লবণাক্ত। শীতল পানি ও লবণাক্ত পানি অধিক ভারী হওয়াতে তা সমুদ্রের অধিক গভীরতায় ডুব দেয় এবং সেখানে থেকেই মধ্য আটলান্টিকের উষ্ণ অঞ্চলে ফেরৎ আসে– আর এভাবেই কনভেয়ার বেল্টের মত চক্রাকার আবর্তনের সৃষ্টি হয়। এটিই সেই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের একটি বড় কারণ যা উত্তর পশ্চিম ইউরোপকে শীত থেকে রক্ষা করছে। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় মেরু অঞ্চলে যা ঘটছে তাতে এখন এই উপসাগরীয় স্রোত ব্যাহত হবার উপক্রম হয়েছে। এ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে মেরু অঞ্চলে বেশি ঘটছে ফলে মেরু অঞ্চল ও উষ্ণ অঞ্চলের উত্তাপ পার্থক্য কমে যাচ্ছে– স্রোতের একটি নিয়ামক দুর্বল হয়ে পড়ছে। তা ছাড়া মেরু অঞ্চলে বরফ জমছে কম, গলছে বেশি, যার ফলে ওখানে লবণাক্ততা কমে যাচ্ছে– ডুব দিয়ে উষ্ণ অঞ্চলে ফেরৎ আসার প্রবণতা কমে যাওয়াতে স্রোতের আরো একটি নিয়ামক দুর্বল হয়ে পড়ছে। এতদিন উপসাগরীয় স্রোতের এভাবে দুর্বল হওয়ার ব্যাপারটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা পর্যায়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত

উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ইতোমধ্যেই উপসাগরীয় স্রোতে প্রবাহিত পানির আয়তন ৩০% কমে গেছে– যা উত্তর পশ্চিম ইউরোপের উত্তাপ ১০° সে পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারছে। ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ যত বাড়বে উপসাগরীয় স্রোতের নিষ্ক্রিয় হবার প্রবণতাও এত বাড়বে। এর ফলে বৃটেন বা নরওয়ের মত দেশের আবহাওয়া ও অর্থনীতির উপর তা চরম আঘাত হানতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্য ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি ওসব দেশের জন্য উত্তাপ সৃষ্টি করবে না, বরং করবে শৈত্য সৃষ্টি।

কৃষির উপর প্রতিক্রিয়া

চরম আবহাওয়ার কারণে কৃষির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়– যেমন বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে ফসল বিনষ্টি। অন্যত্র এই চরম আবহাওয়া খরা বৃদ্ধি, উত্তাপে মাটির শুষ্কতা বৃদ্ধি ও উর্বরতা বিনষ্টি, শুষ্কতার ফলে মাটির অবক্ষয় বৃদ্ধি, উত্তাপের ফলে ফসলের ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি– ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাতে শুরু করেছে। তবে সাধারণভাবে কৃষির ক্ষেত্রে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফল সর্বত্র এক রকম নয়।

নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশের এলাকাগুলোতে উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির ক্ষেত্রে কিছু অনুকূল পরিবেশ বহন করে আনছে। এর কোন কোন অঞ্চলে আগে যেখানে গ্রীষ্মে একটি ফসল শুধু পাওয়া যেত সেখানে এখন ক্ষেত্র বিশেষে দুটি ফসলও আশা করা হচ্ছে। তবে আগের শীতলতর আবহাওয়ার সঙ্গে বহুকাল ধরে খাপ খেয়ে যাওয়া ফসলগুলোর পরিবর্তন সাধন না করে এই সুফলটি নেয়া যাচ্ছেনা।

স্বল্প অক্ষাংশ অবস্থিত উষ্ণতর অঞ্চলগুলোতে অবশ্য অধিকতর উত্তাপ, বাষ্পীভবনের ফলে আর্দ্রতা হারানো, উদ্ভিদের অধিকতর প্রস্বেদনে পানি হারানো– এসবের ফল কৃষির ক্ষেত্রে ভাল হচ্ছেনা।

অন্য দিকে অধিকতর কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটি অনুকূল প্রভাব ফসলের উপর রয়েছে। বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড সালোক সংশ্লেষণে অবদান রেখে ফসলের ফলন বাড়িয়ে দেয়। এক হিসাবে দেখা গেছে কার্বনডাই অক্সাইড

দ্বিগুণ হলে ফলন বাড়াবে ৩০%। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রভাবগুলোর তুলনায় কৃষির উপর তার বিরূপ প্রভাব বরং মোটের উপর অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া সবুজ বিপ্লবের মত ফসলের জাতের উপর গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে তাদেরকে সহনশীল করে তোলা খুব বেশি কঠিন নাও হতে পারে।

নানা দৃশ্যকল্পে নানা ভবিষ্যৎ

জলবায়ু মডেলের যথার্থতা

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা জানতে আমাদেরকে নির্ভর করতে হচ্ছে মডেলিং এর উপর, কারণ বিষয়টি কোন সরল নিয়ম মেনে চলেনা। একেবারে মৌলিক পর্যায়ে এরকম মডেল নির্ভর করে পদার্থবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও সম্পর্কগুলোর উপর। কিন্তু তারপরও এর মধ্যে নানা রকম বৈচিত্রের সুযোগ থাকে। একটি মডেল কতখানি নিখুঁত হবে তার একমাত্র প্রমাণ হলো সঠিক পূর্বাভাষ দিতে এর সাফল্য। এজন্য মডেল কী পূর্বাভাষ দিচ্ছে আর বাস্তবে কী ঘটছে এই দুইটি সম্ভব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে এর যথার্থতা প্রমাণ করার পরই শুধু অজানা ক্ষেত্রেও মডেলটি ব্যবহার করা যায়।

প্রধানত তিনটি উপায়ে মডেলটি পরীক্ষা করা যায়। সাম্প্রতিক ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ মডেলে দিয়ে এর পর পর বিভিন্ন সময়ের জন্য মডেল কী চিত্র খাড়া করছে এবং সেটি প্রকৃত চিত্রের সঙ্গে কী রকম মিল রেখে চলছে তা লক্ষ্য করে এর পরীক্ষা হতে পারে। এই মডেলের সাহায্যে অতীতের জলবায়ু চিত্র হিসাব করে নির্ণয় করা যায় এবং তা অতীতে সত্যিই ঘটে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো স্বাভাবিকের থেকে ভিন্ন কোন পরিস্থিতি ঘটলে তার জন্য এই মডেল কী

পূর্বাভাষ দেয় তা দেখা এবং ঐ ভিন্ন পরিস্থিতির আসল প্রভাবের সঙ্গে তা মিলানো। এরকম পরিস্থিতি হতে পারে যেমন বড় ধরনের একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে। মডেল যদি এই পরিবর্তনে যথেষ্ট সংবেদনশীল হয়, পরিবর্তনগুলোর ফলাফলের সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পারে– তা হলে এটি স্বাভাবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সঠিক ফলাফল দিতে পারবে এটি আশা করা যায়।

২০০৭ সালের আইপিসিসি রিপোর্টের পর যে বিশাল ঐক্যমত্য ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে এরকম পরীক্ষিত জলবায়ু মডেলের মাধ্যমে দেয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ভয়াবহতা। আধুনিক বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ক্ষমতা এখন আমাদেরকে খুবই শক্তিশালী পরীক্ষিত জলবায়ু মডেল দিতে পেরেছে। কিন্তু বিষয়টি এতই জটিল যে এই মডেলেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। খুবই সাম্প্রতিক উপাত্ত না ব্যবহার করলে এর পূর্বাভাষগুলোও যথেষ্ট নিখুঁত হয়না – ভয়াবহ ভবিষ্যতের পুরো চিত্রটি পাওয়া যায়না। আইপিসিসির ২০০৭ রিপোর্টের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও কোন কোন বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ তাতে বেশ কয়েক বছরের পুরানো উপাত্তও ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের মতে আরো সাম্প্রতিক উপাত্ত ব্যবহার করলে ভবিষ্যতের দুর্যোগগুলো আরো তীব্রতর রূপে ভবিষ্যৎদ্বাণীতে আসার কথা। বিষয়টি এখন যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।

সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প

জলবায়ু মডেলের উদ্দেশ্য হলো আগামী দশকগুলোতে, অর্ধশতাব্দী পর এবং এ শতাব্দীর শেষে গিয়ে আমাদের পৃথিবীর অবস্থা কী হবে তা আন্দাজ করতে পারা। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বর্তমানের ঘটনা প্রবাহের উপর এবং সামনে আমরা কী ভাবে আচরণ করবো তার উপর। কারণ পুরো সমস্যাটি সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের দ্বারা, মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের দ্বারা- যা গ্রীন হাউস গ্যাসের উদ্গীরণ বৃদ্ধি করে গেছে, এখনো যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ কত বেশি ভয়াবহ হবে তা নির্ভর করবে জীবনযাত্রার এই ধরন আমরা কত খানি বদলাবো, আদৌ বদলাবো কিনা, গ্রীণ-হাউস গ্যাস বাতাসে যাওয়া বন্ধ করতে আমরা কতখানি সফল হবো– তার উপর। সবাই ভবিষ্যতে কী করবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারবোনা বটে, কিন্তু কতগুলো সম্ভাব্য

দৃশ্যকল্প (সিনারিও) তৈরি করে নিয়ে প্রত্যেকটির জন্য যথাযথ ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া মডেলের মাধ্যমে সম্ভব। আজকের সচেতনতার মাধ্যমে দুর্যোগ এড়াবার, পৃথিবীকে রক্ষার যে আকুতি সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তিতে কাম্য দৃশ্যকল্প যেমন এর মধ্যে থাকবে তেমনি কার্যত যেমন চলছে তেমন চলার নীতিতে গা ভাসিয়ে দেয়ার মত নির্বোধ দৃশ্যকল্পও এতে থাকছে। এখন এর থেকে বাছাই করে নিজেদের করণীয় স্থির করার দায়িত্ব বিশ্বের জনগণের। আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ আচরণের নানা দিকের মধ্যে সম্ভাব্য বৈচিত্র এত বেশি যে অনেক সংখ্যায় দৃশ্যকল্প হতে পারে, এবং মডেলের জন্য এরকম মোট ৩৫টি বিভিন্ন দৃশ্যকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটি গুচ্ছ তৈরি করে সেগুলোর বিষয়টি দেখতে পারি।

এসব দৃশ্যকল্পের মধ্যে যে সব বিষয়ের পার্থক্যগুলো গুরুত্ব পায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন জীবন যাপনে মানুষের আচরণ– বিশেষ করে শক্তি উৎসের ব্যবহারে এবং জৈব বর্জ্যের সৃষ্টি ও নিষ্কাশনে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারার ইত্যাদিতে। মোটা দাগে দৃশ্যকল্পগুলোকে আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি:

ক) বিশ্বের সর্বত্র আচরণরীতি একই রকম হয়ে আসবে– যার মধ্যে দেখা যাবে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা ২০৫০ নাগাদ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে, ধনী ও দরিদ্র দেশের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য কমে যাবে, তবে এ সব কিছুর জন্য ফসিল জ্বালানীর উপরেই প্রধান নির্ভরশীলতা থাকবে।

খ) সবই প্রায় 'ক' এর মত, কিন্তু ফসিল জ্বালানীর বদলে নবায়নযোগ্য শক্তির উপর প্রধান নির্ভরশীলতা থাকবে।

গ) বিশ্বের নানা অঞ্চলে উন্নয়ন নানা স্তরে থাকবে। আচরণরীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরনও বিভিন্ন হবে। কোন কোন অঞ্চলে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে খুব বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে মন্থর। শক্তি উৎসও বিচিত্র– তবে ফসিল জ্বালানিই বেশি।

ঘ) 'ক' এর মতই, জনসংখ্যা আপাতত বাড়বে তবে ২০৫০ এর দিকে শীর্ষে পৌঁছে কমে আসবে। পৃথিবীর সর্বত্র উন্নয়ন ধারা একরকম,

মাথাপিছু আয় বৈষম্যও কমে আসবে। ভারী শিল্পের বদলে সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তি এবং সার্ভিস ভিত্তিক শিল্পের উপরেই গুরুত্ব বেশি দেয়া হবে– মেধাঘন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দ্রুত বাড়বে সর্বত্র। তাছাড়া দূষণহীন ও টেকসই প্রযুক্তির প্রচলন সর্বত্র বিস্তৃত হবে।

ঙ) টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাধানের উপরই গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় বৈচিত্র থাকবে। জনসংখ্যার হার হবে বিভিন্ন, তবে অধিকাংশ অঞ্চলে হারটি যথেষ্ট বেশি থাকবে।

মডেল থেকে দেখা গেছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদগীরণের দিক থেকে সব চেয়ে অগ্রহণযোগ্য দৃশ্যকল্প হলো 'ক' এবং সব চেয়ে কাম্য হলো 'ঘ'। মিথেনের উদগীরণের ক্ষেত্রে সব চেয়ে অগ্রহণযোগ্য হলো 'গ' এবং সবচেয়ে কাম্য 'ঘ'। যেহেতু উত্তাপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্বন-ডাই-অক্সাইড অবদানই মোটের উপর বেশি, তাই মোটের উপর সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য হলো 'ক' এবং সবচেয়ে কাম্য 'ঘ'।

অগ্রহণযোগ্য দৃশ্যকল্প ও তার পরিণতি

সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য দৃশ্যকল্পে সারা পৃথিবী একযোগে একই রকম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের দৌড়ে ব্যস্ত। আর এটি করার পথে যে কোন ধরনের ফসিল জ্বালানি যে কোন পরিমাণে ব্যবহার করতে কেউ দ্বিধা করছেনা। জীবন ধারনের ভঙ্গির মধ্যে ধনীদেশগুলোর বিলাসী ও ভোগবাদী উদাহরণকে সবাই যথাসাধ্য অনুকরণ করবে এবং অনেকটা সক্ষমও হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অনেক কথা বল্লেও শেষ পর্যন্ত সেটি বন্ধের জন্য নিজেদের আচরণ ও নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কোন ছাড় দেবেনা বা পরিবর্তন আনবেনা। জনসংখ্যা আপাতত বেড়েই চলবে, যদিও অবশ্য বাড়ার হার কমে আসবে এবং ২০৫০ এর মধ্যে শীর্ষে পৌঁছাবার পর তা কমতে থাকবে। জীবন-ভঙ্গি ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির কামনায় জনসংখ্যার উপর একটি রাশটান শেষ পর্যন্ত থাকলেও বিশাল জনসংখ্যার উন্নয়নের চেষ্টায় ফসিল জ্বালানি ভিত্তিক ব্যাপক কর্মকান্ড চলতেই থাকবে।

আর একটি অগ্রহণযোগ্য দৃশ্যকল্পে ফসিল জ্বালানীর ক্ষেত্রে সচেতন উন্নত দেশগুলো কিছুটা সীমা টেনে দেবার কারণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ

কিছুটা কমবে। কিন্তু এই ব্যাপারে সারা বিশ্বের সমঝোতা থাকবেনা, এবং বিশ্বের নানা অঞ্চল একই ভাবে এগুবেওনা। বহু দেশে বিশাল জনসংখ্যার দারিদ্র থেকে যাবে, প্রবৃদ্ধিও খুব কম হবে। তাদের কৃষিনির্ভর, বায়োম্যাস-নির্ভর অর্থনীতিতে প্রচুর মিথেন সৃষ্টিকারী উপাদান থাকবে। উন্নত দেশেও ভোগবাদী চাহিদার কারণে প্রচুর জৈব বর্জ্য ও প্রচুর মিথেন উদ্গীরণ ঘটে। দরিদ্র দেশ সমূহে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার না কমার কারণেও জৈব বর্জ্য ও মিথেন সৃষ্টি ক্রমেই বাড়তে থাকবে।

এই উভয় দৃশ্যকল্প গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় উচ্চ অবদান রাখবে। ভবিষ্যৎ যদি এরকম হয় বা বছরের পর বছর আরো ঐ অভিমুখেই যায় তা হলে আমরা মডেলের সব চেয়ে ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সম্মুখীন হবো। বিশেষ করে প্রথমোক্ত দৃশ্যকল্পের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে।

মডেলের হিসাব বলছে এরকম সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য বিকল্প যদি আমরা গ্রহণ করি তা হলে ২১০০ সালের দিকে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ ৬.৪° সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে। মনে রাখতে হবে যে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া বহু দশক আগে থেকেই যথেষ্ট উর্দ্ধমুখী হলেও এই সব বছরে এই উত্তাপ বেড়েছে মাত্র ০.৬° ডিগ্রি। এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের যত আলামত দেখতে পাচ্ছি তা এইটুকুরই ফলশ্রুতি। শতাব্দীর শেষে গিয়ে এই উত্তাপ যদি দশগুণ বেড়ে যায় কী হতে পারে তা অভাবনীয়। উদাহরণ স্বরূপ সেক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে অন্তত এক মিটার। তার ফলে বাংলাদেশের ১৭% সমুদ্রতলে তলিয়ে যাবে, মালদ্বীপ সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে। এমনকি লন্ডন ও নিউইয়র্কের মত সুসংগঠিত বৃহৎ নগরীগুলোও সমুদ্রের পানির দ্বারা বিপন্ন হবে। বিশ্বের বহু দেশে সুপেয় পানি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি যদি ২.৪° সে ছাড়িয়ে যায় তা হলেই সঞ্চিত বরফের ম্যাস ব্যালেন্স এতো অস্থিতিশীল ভাবে কমতে শুরু করবে যে সেই ক্ষেত্রে শতাব্দী শেষে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা এক মিটারে সীমাবদ্ধ না থেকে তা কয়েক মিটারেও গিয়ে দাঁড়াতে পারে। লারসেন-বি ইত্যাদি আইস-শেলফ গলার মাধ্যমে পশ্চিম আন্টার্কটিকার যে বরফ গলন শুরু হয়েছে শুধু তা সম্পূর্ণ হলেই সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৬ মিটার। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অস্থিত্বই বিপন্ন হবে

– পৃথিবীর ইতিহাসের অকল্পনীয় মানব ট্র্যাজেডির ঘটনা ঘটবে। এই দৃশ্যকল্পের বেপরোয়া ভাবগুলো যদি এতটা তীব্র না হয়ে আমরা কিছুটা সাবধানী হই, তা হলে হয়তো শতাব্দীর শেষের এই বিপর্যয় কিছুটা নমনীয় হবে। তবে এ ধরনের দৃশ্যকল্পের ভয়াবহ ক্ষতি সব রকম পরিস্থিতিতেই কমবেশি অনিবার্য।

কাম্য দৃশ্যকল্পে ক্ষতি কতটা কমবে

মানুষের সৃষ্ট গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকেই। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ আরো দ্রুত হারে প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে যা বাতাসে গিয়েছে তা সেখানে শতাধিক বছর ধরে কার্যকর থেকে প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে থাকবে। তাছাড়া যত চেষ্টাই করি এর ভবিষ্যৎ উদ্গীরণ আমরা বন্ধ করতে পারবনা, সীমাবদ্ধ করতে পারবো মাত্র। কাজেই সব চাইতে কাম্য দৃশ্যকল্পেও একটি ন্যূনতম বিপর্যয় ঘটবেই, মডেল আমাদেরকে তার থেকে অব্যাহতি দিতে পারছেনা। তবে এরকম দৃশ্যকল্প আমাদেরকে ন্যূনতম ক্ষতি বা তার কাছাকাছি থাকতে সাহায্য করবে।

এই কাম্য দৃশ্যকল্পে একটি বিশ্বজনীনতা থাকবে– সারা দুনিয়ার সবাই এক লক্ষ্যে কাজ করবে, নিজেদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য কমিয়ে আনবে, দারিদ্র দূর করবে। যেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি সেসব জায়গায় তার রাশ টেনে ধরে ২০৫০ এর মধ্যে বৃদ্ধি শেষ করে তারপর নামানোর ব্যবস্থা করবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সবাই শক্তিঘন ও বস্তুঘন উন্নয়নের পথ বাদ দিয়ে মেধাঘন তথ্য প্রযুক্তি ও সেবা নির্ভর উন্নয়নের পথে যাবে। ওখানে শক্তি আসবে প্রায় সবটাই নবায়নযোগ্য উৎস থেকে যাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হবেনা। বর্জ্য সৃষ্টির প্রবণতা কমে যাবে, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারের অভ্যাস সবার মধ্যেই মজ্জাগত হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চরমে নিয়ে যাওয়া নয়, অর্থনীতিকে পরিবেশের দিক থেকে টেকসই করাটাই হবে সবার অগ্রাধিকার।

এই দৃশ্যকল্পকেই যদি এখন থেকে বাস্তবায়িত করা যায় তা হলে মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী হলো শতাব্দীর শেষে গিয়ে আমরা ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করেই

রেহাই পেয়ে যেতে পারি। সেই ক্ষেত্রে ২১০০ সালে গিয়ে ভূপৃষ্ঠ উত্তাপ বাড়বে ২.৪° সে বা তার কিছু বেশি। উত্তাপকে এই পর্যায়ে রাখতে হলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণকে শিগ্‌গির ৪৫০ থেকে ৫০০ পিপিএম এর মধ্যে বেঁধে ফেলে সেখানেই স্থায়ী রাখতে হবে। বর্তমানে এই পরিমাণ হলো ৩৮০ পিপিএম। তাই ঐ মাত্রায় বেঁধে ফেলার জন্য আমাদের সময় রয়েছে ১০ থেকে ২০ বছর। এর মধ্যেই উদ্গীরণ নাটকীয়ভাবে কমিয়ে ফেলতে না পারলে ন্যূনতম ক্ষতি নিয়ে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না। এটি করতে যত দেরী হবে, ততই শতাব্দী শেষের উত্তাপ ২.৪° সে থেকে বেড়ে যেতে থাকবে।

ন্যূনতম ক্ষতির ক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতার কী হবে? মডেল বলছে আমরা যদি কাম্য সব কিছুই ঠিকঠাক করতে সমর্থও হই শতাব্দীর শেষে গিয়ে অন্তত: ১০ সে.মি. উচ্চতা বৃদ্ধি সমুদ্রের ঘটবেই। যদি সত্যিই তা হয়, উষ্ণতাকে ২.৪° সে এর কাছে রেখে, বরফের ম্যাস ব্যালেন্সকে অস্থিতিশীল হওয়া থেকে রক্ষা করে আমরা যদি এইটুকু বৃদ্ধিতেই সমুদ্রকে রেখে দিতে পারি তা হলে বাংলাদেশ বা মালদ্বীপের মত দেশের জন্য তা চরম ভাগ্য মনে করতে হবে। সেক্ষেত্রে বন্যা, লবণাক্ততা, তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের আধিক্য ইত্যাদিও শতাব্দীর শেষে গিয়ে অনেকখানি প্রকট হলেও তা হয়তো আমাদের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

আমাদের একটিই পৃথিবী

ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে

সম্ভাব্য দৃশ্যকল্পগুলো এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে জলবায়ু মডেল যা বলছে তাতে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে এ সম্পর্কে আমরা যাই করি না কেন তা পুরো পৃথিবীর সবাইকে মিলেই করতে হবে– কাউকে বাদ দেয়া যাবেনা। কারণ ব্যাপারটি পুরো পৃথিবীকে নিয়েই। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা যখন এতটা জানতামনা, সেই ১৯৯২ সালে রিও ধরিত্রী সম্মেলনেই সবাই উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে আমাদের একটিই পৃথিবী, একে বাঁচাবার দায়িত্বটি আমাদের হাতেই। সামাজিক ভাবেও এটি আমাদের সবাইকেই করতে হবে। বাঁচবার পথ একটিই– গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ কমাতে হবে, অনেক কমাতে হবে এবং তা শিগ্‌গির করতে হবে যাতে দশ বিশ বছরের পর এটি আর মোটেও না বাড়তে পারে। এর প্রধান গুরুত্বটি দিতে হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণের ক্ষেত্রে। তারপরেই আসে মিথেন উদ্গীরণের প্রশ্নটি। নাইট্রোজেন অক্সাইড, সিএফসি ইত্যাদি আরো কিছু গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রশ্নও আসে, যদিও তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বে। দৃশ্যকল্পের আলোচনা থেকে আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ বন্ধ করার বিষয়টি একটি দুটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার নয়। এটি আমাদের পুরো আচরণ, অর্থনৈতিক আশা আকাঙ্খা এবং জীবন যাপনের ভঙ্গির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই সব কিছুতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার মাধ্যমেই শুধু এটি সম্ভব।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ হ্রাস

বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের মূলে বড় কারণ হলো ফসিল জ্বালানীর দহনের ফলে সৃষ্ট বাড়তি কার্বনডাই অক্সাইড উদ্গীরণ। কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস– এসবই প্রধান ফসিল জ্বালানী। এর মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণের ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে খুব বেশি দায়ী হলো কয়লা। কিন্তু এখনো পৃথিবীর খুব গুরুত্বপূর্ণ বিপুল জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশগুলোতেও অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কয়লার মাধ্যমে। পেট্রোলিয়াম জ্বালানিও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচুর ব্যবহৃত হয়, তবে যানবাহনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রায় একচ্ছত্র। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে যাচ্ছে। ফসিল জ্বালানীর মধ্যে এদিক থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান তুলনামূলকভাবে কম। কাজেই আমাদের দেশে আমরা যখন পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের বদলে গাড়িকে সিএনজি (কমপ্রেস্ড নেচারাল গ্যাস) ব্যবহারের উপযুক্ত করি তখন শুধু একে ব্যয়সাশ্রয়ী করে তুলছিনা, গ্রীন হাউস গ্যাসও কমিয়ে ফেলছি। অবশ্য সব চেয়ে কার্যকর ভাবে সেটি করার উপায় হলো ফসিল জ্বালানি একেবারে ব্যবহার না করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ বিহীন বিকল্প শক্তি উৎস ব্যবহার করা। তবে ফসিল জ্বালানির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা এত বেশি যে ইচ্ছে করলেই চট্ করে এর ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এর ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতিকে আরো জ্বালানিদক্ষ করে তুলে এবং শক্তির অপচয় রোধ করে ফসিল জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুটা কমিয়ে ফেলা যায়। সকল দেশে দেশে এই প্রচেষ্টা শুরু করা জরুরী। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি, দক্ষ মোটর ইত্যাদি দক্ষ যন্ত্রপাতির উন্নয়ন এবং তাদের ব্যবহার বৃদ্ধি এখন সার্বিক সচেতনতা ও প্রচেষ্টার অংশ।

এদিক থেকে আর একটি প্রচেষ্টা হলো ফসিল জ্বালানী দহনের কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হবার পরেও তাকে বাতাসে যেতে না দেয়া। বনাঞ্চল বৃদ্ধি করে উদ্ভিদের মাধ্যমে এ কাজ করা যায়। তবে আরো প্রত্যক্ষ উপায়েও আজকাল তা করা হচ্ছে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সরিয়ে পরে তাকে ভূগর্ভে এমনভাবে কবর দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে এটি উঠে এসে বাতাসে আর না যেতে পারে।

সব চেয়ে ভাল হয় যদি ফসিল জ্বালানি আদৌ ব্যবহার না করে তার বদলে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পানিশক্তি, সমুদ্র জোয়ার ভাটা বা ঢেউয়ের শক্তি ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তি অথবা পারমানবিক শক্তি (যার অবশ্য অন্য সমস্যা রয়েছে) ব্যবহার করা হয়, যে সবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আদৌ নির্গত হয় না। এ কাজে বিশ্ব বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু আরো অনেক এগুতে হবে, কারণ এখনো ফসিল জ্বালানির ব্যবহারই অনেক বেশি। বিশেষ করে যানবাহনের ক্ষেত্রে ফসিল জ্বালানি থেকে বের হয়ে যেতে পারা এখন খুবই জরুরী। সৌরশক্তি দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করা অথবা ফুয়েলসেল চালিত বৈদ্যুতিক গাড়িই হয়তো সমাধান এনে দেবে। এই সব কিছুতে গবেষণায় দ্রুত উন্নতি আনার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ কমাবার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় হ্রাস, বিকল্প শক্তি উৎস ব্যবহার, এই গ্যাস সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা ইত্যাদিকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক ভাবে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে। কিয়োতো প্রটোকলে উন্নত দেশ, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো কারা কী হারে গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ করতে পারবে তার একটি বাটোয়ারা সমঝোতার মাধ্যমে করার চেষ্টা হয়েছে। মূল নীতিটি হলো শিল্পোন্নত দেশগুলো অতীতে প্রচুর উদ্গীরণ করেছে তাদের ভবিষ্যৎ উদ্গীরণের একটি উর্দ্ধ সীমা টেনে দেয়া হয়েছে। সে তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকতর উদ্গীরণ করতে পারবে। তাদের উদ্গীরণ বন্ধে উন্নত দেশগুলো সহায়ক হবে। এ জন্য এসেছে উন্নত দেশে কার্বন ট্যাক্স যেখানে অধিক উদ্গীরণকে অর্থ দন্ড দেয়া হচ্ছে। এসেছে কার্বন মার্কেট যেখানে উদ্গীরণের সুযোগকে বেচাকেনা করা যায় যাতে উন্নত দেশে উদ্গীরণের জন্য একটি মূল্য দিতে হয়। উন্নয়নশীল দেশকে উদ্গীরণ কমাবার কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য উদ্গীরণের কোটা উন্নত দেশের কেউ নিজে ব্যবহার করতে পারে– যেটি ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম বা সিডিএম (দূষণবিহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া) বলে পরিচিত। সব কিছুর উদ্দেশ্য একটিই– কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অন্য গ্রীন হাউস গ্যাস বাতাসে যেতে না দেয়া।

২০০৮ সালের ২০ জানুয়ারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ ২০% কমিয়ে ফেলে ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যূনতম ক্ষতির বিকল্পে পৌঁছার জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে।

মিথেন ও অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস হ্রাস

গ্রীন হাউস গ্যাস হিসাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরেই ভূমিকা রয়েছে মিথেনের। তাই জলবায়ু মডেলের দৃশ্যকল্প সমূহে মিথেন উদ্গীরণ করা বা না করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এটিও আমাদের কর্মকান্ড ও জীবন যাত্রার ধরনের সঙ্গে জড়িত। কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কারণ জলাভূমি, ধান চাষ, গো-মহিষাদি– এগুলো মিথেনের বড় উৎস। অর্থনৈতিক কারণে এগুলো কমানো সম্ভব না হলেও মিথেনের অন্যান্য কিছু উৎস আমরা আমাদের অভ্যাস বদলের মাধ্যমেই বন্ধ করতে পারি। এর মধ্যে বড় একটি উৎস হলো জৈব বর্জ্য– দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ থেকে জৈব বর্জ্যের অনেক খানিই যায় নিচু স্থান ভরাট করার কাজে (ল্যান্ড ফিল)। এ সব জায়গায় জৈব বস্তুর পচনের মাধ্যমে প্রচুর মিথেন গ্যাস বাতাসে যায়। বর্জ্য কমিয়ে ও ভিন্নভাবে নিষ্কাশন করে আমরা এটি কমাতে পারি এই গ্যাসকে সংগ্রহ করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেও উদ্গীরণ ঠেকাতে পারি। এভাবে মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র সহ অনেক কিছুর অসতর্ক নিষ্কাশনের মাধ্যমে জৈব বর্জ্যের মিথেন উদ্গীরণ না করে, বরং বায়োগ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবহার করে ফেলতে পারি। উন্নত ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এরকম গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ কমাবার নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করছে। যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে অষ্ট্রেলিয়ায় এমন ভেড়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে যার হাই তোলার পরিমাণ কম হবে, ফলে মিথেন উদ্গীরণও কম হবে।

কয়লা খনি, প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি ও পাইপের মাধ্যমে তার বন্টন ব্যবস্থা, কিছু কিছু শিল্প কারখানা মিথেনের অন্য বড় উৎস। এখানে সতর্কতা অবলম্বন করলে লীক করে মিথেন বাতাসে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে। মিথেন সৃষ্টি-কারী বর্জ্য কমাবার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ভোগের বিষয়টি জড়িত রয়েছে। বিশেষ করে ধনী দেশগুলোতে খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য জৈব পণ্যের

অধিক উৎপাদন, এসবের অতিব্যবহার এবং অপচয় অধিক মিথেনের জন্য দায়ী। তেমনি দায়ী অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি রকমের প্যাকেজিং ব্যবস্থা– যার অনেক খানি বর্জ্য হিসাবে পরিত্যক্ত হয়ে মিথেন তৈরি করে। প্যাকেজিং দ্রব্য সহ এরকম অনেক কিছুর রিসাইক্লিং বা পুনব্যবহার এই ব্যাপারে সহায়ক হবে। অনেক সময় পানি ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মিথেনের বড় উৎসের কারণ ঘটায়। বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে পানির চলাচল রূদ্ধ করলে জলাভূমির সৃষ্টি হয়ে এমনটি ঘটতে পারে। অনেকের পরামর্শ হলো এদিক থেকে সহনীয় বন্যার সঙ্গে বসবাসের সহায়ক প্রযুক্তিগুলোই বরং উন্নত করা উচিত।

অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে রয়েছে নাইট্রোজেন অক্সাইড যা সার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য থেকে উদগীর্ণ হয়, বিভিন্ন শিল্প দূষণ থেকেও হয়। আগে রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদিতে মূল কার্যকর গ্যাস হিসাব সিএফসির (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন) প্রচুর ব্যবহার ছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন তরল স্প্রে করার কাজে স্প্রেয়ারে চাপ সৃষ্টির জন্যও (এরোসল) এটি অতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এখনো অনেক জায়গায় তা হচ্ছে। সিএফসি'র গ্রীন হাউস গ্যাস বৈশিষ্টের কারণে এর ব্যবহার এখন অনেকাংশে নিষিদ্ধ হয়েছে– এর জায়গায় বিকল্প নির্দোষ গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। গ্রীন হাউস গ্যাস হওয়া ছাড়াও সিএফসির আরো একটি বড় দোষ রয়েছে, তা হলো এটি উর্দ্ধাকাশে গিয়ে পৃথিবীর চারিদিকে একটি সুরক্ষা আবরণ ওজোন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। ওজোন স্তর ক্ষতিকর আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে অধিক আসতে বাধা দেয়। সিএফসি'র সঙ্গে বিক্রিয়া ওজোন স্তরকে নষ্ট করে দেয়, ফলে বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে এতে বড় বড় ফুটোর সৃষ্টি করে। এতে অধিক আলট্রা ভায়োলেট এসে আমাদের এবং জীব জগতের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

আমরা বিশ্ব-নাগরিক

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের অতি বাস্তব হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে এর প্রতিকার হওয়া না হওয়া এখনো অনেকটাই আমাদের হাতে। পৃথিবীর সাড়ে চারশত কোটি বছরের ইতিহাসে এরকম

জলবায়ু পরিবর্তন, এমনকি এর থেকেও অনেকগুণ তীব্র মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে। সে সময় মানুষ দৃশ্যপটে ছিলনা, তার করারও কিছু ছিলনা। কিন্তু বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং এখনো এর প্রতিকার করার সুযোগ আমাদের হাতে রয়েছে। এই প্রতিকার শুধু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করেনা, দেশের সরকারের উপরও এককভাবে নির্ভর করেনা। বরং পৃথিবীর সকল মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস ও জীবনযাত্রার উপরেও তা অনেক খানি নির্ভর করে। তাই একেবারে বাস্তব অর্থেই ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। এ প্রতিকার না করতে পারার অর্থ হলো নিজেদেরকে এবং আরো বেশি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে অনিবার্য চরম দুর্যোগের মুখে ঠেলে দেয়া।

এ প্রতিকারের পথে আমাদেরকে পথ দেখাবে, উদ্বুদ্ধ করবে এবং সাহস যোগাবে আমাদের সচেতনতা এবং আমাদের জ্ঞান। এ জন্যই এর ভয়াবহতার কথা ভাসা ভাসা শুনলেই শুধু হবে না। এর পেছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণাগুলো কী উদ্ঘাটন এ পর্যন্ত করেছে এবং আরো করে চলছে সেটি অনুধাবনের চেষ্টা আমাদের সবারই করা উচিত। তা হলে বুঝতে পারবো আমাদেরকে এখন কী করতে হবে, কতখানি করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো এই করাটির মধ্যে শুধু যে ত্যাগ ও বর্জনের ব্যাপার আছে তা নয়, বরং পরিবেশের সঙ্গে একটি সুন্দর ভারসাম্য থাকার সুযোগ নিয়ে এটি সত্যিকার অর্থেই আমাদের জীবনযাত্রাকে আরো সুন্দর আরো উপভোগ্যই করে তুলতে পারবে। আমরা সারা বিশ্বের মানুষ একযোগে একাত্ম হয়ে সকল মানুষের জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও টেকসই করার চেষ্টা করছি এবং করতে পারবো– এই উপলব্ধিও আমাদেরকে বিশ্ব-নাগরিক হিসাবে একটি আলাদা মূল্য দেয়। এ বইয়ে আমরা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে গবেষণাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে, কীভাবে এর প্রকৃতি ও প্রতিকারের বিষয়গুলো আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হচ্ছে তা বুঝার চেষ্টা করে, সেভাবে বিশ্ব নাগরিক হবারই চেষ্টা করলাম।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। ঘুর্ণিঝড় 'সিডর', 'নার্গিস' ইত্যাদি কি বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটছে?

উত্তর হতে পারে, গবেষণায় দেখা গেছে যে ঘূর্ণিঝড়ের মোট সংখ্যা না বাড়লেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তীব্রতম পর্যায়ের ঘুর্ণিঝড়গুলোর সংখ্যা স্পষ্ট ভাবে বেড়েছে। এটি তারই অংশ হতে পারে।

প্রশ্ন ২। উন্নত দেশগুলোই বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। শিল্পোন্নত হতে গিয়ে তারা বেপরোয়াভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ করেছে এতদিন ধরে। এখন এর প্রতিকার তাদের কি আরো অনেক বেশি করা উচিত নয়?

উত্তর অবশ্যই, এবং সবাই তাই বলছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আমরা বলছি, আমরা বড় দায়ী নই, অথচ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবো আমরা। উন্নত অনেক দেশ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে এর প্রতিকারে সচেষ্ট হয়েছে, কিন্তু সবাই হয়নি। এই ব্যাপারে বিশ্বসভায় আমাদের বক্তব্য আরো জোরালোভাবে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৩। সূর্যের থেকে পাওয়া তাপ পৃথিবী থেকে ফিরে যাওয়ার সময় বায়ুমন্ডলে বাধা পাচ্ছে, আসার সময় তা ওভাবে বাধা না পেয়ে অবাধে চলে আসছে কী ভাবে?

উত্তর না একেবারে অবাধে আসেনা, বায়ুমন্ডলে এর বেশ কিছু বাধা পায়, ঠিকরে অন্যদিকেও চলে যায়। তবে এটি ঠিক যে অনেকটাই

পৃথিবীতে চলে আসতে পারে। এর কারণ এর তরঙ্গদৈর্ঘ। এই তরঙ্গদৈর্ঘের বিকিরণ বায়ুমন্ডলে তেমন শোষিত হয়না। ফেরৎ যাবার সময় পৃথিবী নিম্ন উত্তাপে বিকিরণ করছে বলে তরঙ্গদৈর্ঘ থাকে প্রায় সবটাই ইনফ্রারেড বা তাপের। এটিই গ্রীন হাউস গ্যাসগুলো ভাল শোষণ করতে পারে। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া এভাবেই সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৪। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ছয় ঋতু কি বদলে যাচ্ছে?

উত্তর হ্যাঁ তা খুব সম্ভব বদলাচ্ছে। গড় উত্তাপ যদি বাড়ে তা হলে বসন্ত আর গ্রীষ্ম গরমে একাকার হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এরকম আমরা প্রায়ই হতে দেখছি। অন্যদিকে শরৎ হয়ে পড়ছে বর্ষার অংশ, হেমন্তের শিশির পড়ছে দেরীতে কারণ চিরন্তন ভোরের শীতল পরশ আসতে দেরি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হতে থাকলে সামনে এটি আরো স্পষ্ট বুঝা যাবে।

প্রশ্ন ৫। গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ বন্ধ করার মানে হলো আমাদের উন্নয়ন বন্ধ করা। তাছাড়া কৃষি, শিল্প সব কিছুতেই গ্রীন হাউস গ্যাসের ব্যাপার রয়েছে। তা হলে কি এসব বাদ দিয় আমাদেরকে আদিম যুগে ফেরৎ যেতে হবে?

উত্তর না তা করতে হবে কেন। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে কিওতো প্রটোকলের মধ্যেই আমাদের গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের সুযোগ এখনো রয়েছে। তা সত্ত্বেও নিজের স্বার্থেই আমাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগগুলো নেয়া উচিত এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে যথাসম্ভব নবায়নযোগ্য শক্তি ও পরিবেশবান্ধব প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নিয়ে যাওয়া উচিত। এটি মোটেও আদিম যুগে ফিরে যাওয়া হবেনা, বরং এটি আরো যৌক্তিক আধুনিকতার দিকে যাওয়া হবে। সর্বত্রই এখন ভারী শিল্পের বদলে তথ্য প্রযুক্তি ও মেধানির্ভর শিল্পের গুরুত্ব বাড়ছে এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টেকসই উন্নয়নকে মূল্য দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন ৬। মেশিন ব্যবহার করলেই তো দূষণ হবে, এটি আমরা কীভাবে এড়িয়ে যাব?

উত্তর না মেশিন বা ইঞ্জিন মানেই দূষণ নয়। এখানেই আধুনিক দক্ষ যন্ত্রপাতির গুরুত্ব। ক্রমেই দূষণহীন যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হচ্ছে। শুরুতে সেগুলো ব্যয়বহুল মনে হলেও পরিবেশের দূষণের জন্য দিতে হওয়া মূল্যের কথা চিন্তা করলে এরাই বরং ব্যয়সাশ্রয়ী। আমাদেরকে উন্নত চুলা থেকে আরম্ভ করে সব ব্যাপারে এরকম দূষণহীন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন ৭। নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে যে বর্জ্যগুলো তৈরি হয় সেগুলো আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনকে কী ভাবে প্রভাবিত করছে?

উত্তর নিউক্লিয়ার শক্তির বড় ব্যবহার হচ্ছে বিদ্যুৎ তৈরিতে। এর সৃষ্ট বর্জ্য খুব দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয়ার কারণে অত্যন্ত ক্ষতিকর, এবং তার নিরাপদে সংরক্ষণ খুবই দুরূহ। তবে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনটি ক্ষতিকর নয়, কারণ এতে গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ হয়না। এজন্য বরং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রতিকার হিসাবেই অনেকে এটি গ্রহণ করতে চান। তবে এর আরো ঝুঁকি রয়েছে। নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটলে তা সারা পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ুর জন্য মারাত্মক হতে পারে– যেমন চেরনোবীল দুর্ঘটনার সময় হয়েছিলো। খোলা জায়গায় নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষা করা হলে তাও জলবায়ুতে খুবই ক্ষতিকর প্রভাব রাখে। বর্তমানে এমন পরীক্ষা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ৮। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে আমরা শুধু উষ্ণতা বৃদ্ধিই লক্ষ্য করছিনা বহু উল্টাপাল্টা জিনিসও দেখছি, যেমন গরমের মধ্যে শীত, বা শীতের মধ্যে গরম। এটি কেন?

উত্তর জলবায়ু পরিবর্তন সব সময় সরল রেখায় চলেনা, এর এক অংশের প্রতিক্রিয়া অন্যক্ষেত্রে অন্য রকম ভাবে দেখা যেতে পারে। যেমন এর ফলে উপসাগরীয় স্রোত দুর্বল হয়ে পড়াতে উত্তর পশ্চিম

ইউরোপে শীত বরং বেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে– এটি আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে ব্যতিক্রমী ঠাণ্ডা-গরমটি ঠিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হচ্ছে কিনা এটি এখনো নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে আরো গবেষণা প্রয়োজন। একটি বিষয় স্পষ্ট যে জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু সার্বিক প্রভাব সর্বত্র যেমন রয়েছে, তেমনি বেশ কিছু আঞ্চলিক প্রভাবও রয়েছে। আঞ্চলিক প্রভাবগুলোর ক্ষেত্রে অন্যান্য নিয়ামকের সঙ্গে মিলিয়ে আলাদা গবেষণা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৯। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে ওজোন স্তর নষ্ট হবার সম্পর্ক কী?

উত্তর জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে ওজোন স্তর নষ্ট হবার সরাসরি সম্পর্ক নাই। ওজোন স্তর নষ্ট হবার কারণে সূর্যের ক্ষতিকর আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীতে বেশি আসছে। উভয় ক্ষতির জন্য অবশ্য একই জিনিস- সিএফসি দায়ী হতে পারে। এটি একটি গ্রীন হাউস গ্যাস, আবার ওজোন স্তরও নষ্ট করে। তাই সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার আজকাল সর্বত্র নিষিদ্ধ।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৭৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারে সচেষ্ট রয়েছে।